লেডি বি গুড্ বইটিতে ইলেনর পাওয়েল ও য়্যান্ সাদর্ন, ষ্টেপস্ দিস্ ওয়েতে মার্কস্ ব্রাদার্স, ওয়াশিংটন্ মেলোড্রামাতে ফ্রাঙ্ক মর্গান্ ও য়্যান রাদারফোর্ড, এবং ম্যান্ ফ্রম্ দি সিটিতে রবার্ট ষ্টারলিং অভিনয় করেছেন।

অপর ছবিটি হচ্ছে ডাঃ কিল্ ডেয়ার সিরিজের সপ্তম বইখানি। বই খানিতে অভিনয় করছেন লিউ এরেস্, লায়নেল্ বেরিমুর, লারাইন্ ডে। বইখানির নাম কি হবে এখনও ঠিক করা হয়নি।

গত কয়েক সপ্তাহে ক'লকাতায় এম্, জি, এমের দি ফিলাডেলফিয়া ষ্টোরি, ফ্লাইট্ কমাণ্ড, এণ্ডি হার্ডিস্ প্রাইভেট্ সেক্রেটারি প্রভৃতি কয়েক খানা ছবি দেখান হয়েছে।

দি অ্যাকাডেমি অফ মোশান্ পিক্চার আর্ট এণ্ড সায়ান্সেস্ শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা হিসাবে ডোনাণ্ড ষ্টুয়ার্টর লেখা দি ফিলাডেল্ফিয়া ষ্টোরির নামই ঘোষণা করেছেন, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে ঘোষণা করেছেন জেম্স্ ষ্টুয়ার্টকে—ঐ বই খানিতেই। বই কখানা অনেক দিন আগেই দেখান হয়ে গেছে, কাজেই আমরা এখন আর তার সমালোচনা করলাম না, সেটা বিশেষ কাজে আসবে না ব'লে। মোটামুটি বলা যায় ছবিগুলো আমাদের ভালই লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও।

কিন্তু যে বইগুলো দেখান হ'য়ে গেছে, এবং যে গুলো সম্প্রতি তোলা হচ্ছে, একটু ভেবে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে এদের মধ্যে অধিকাংশ ছবিতেই রয়েছে জীবনের সমস্ত লঘুতার অন্তরালে নিহিত গভীর দিক সম্বন্ধে একটা আলোচনার প্রচেষ্টা। গত বৎসরের যে বইগুলি নানা প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হয়েছে,—যেমন, অল্ দিস্ এণ্ড হেভেন্ টু, রেবেকা, ফরেন্ করস্পেনডান্ট্ প্রভৃতি—সে গুলোর মধ্যেও আমরা ঐ একই প্রচেষ্টা দেখতে পাই।

উল্লিখিত ছবিগুলি সবই মার্কিন্। ভারতে মার্কিন্ ছবি দেখান হচ্ছে আজ নয়, বহুদিন আগে হতেই। সবাক চিত্র আবিষ্কৃত হবার বহু পূর্ব্বে নির্ব্বাক ছবি আসত ক'লকাতার গ্লোবে এবং ম্যাডানে। তারপর বিলিতি ছবি এসেছে, ভারতে অনেক স্টুডিও খোলা হয়েছে, কিন্তু তবুও মার্কিন্ ছবির আমদানি কমেনি। ভারতে যথেষ্ট কাপড়ের কল থাকলেও যেমন বিলিতি কাপড় এখানে অচল হয়ে যায়নি, তেমনই দেশী চিত্র তোলা হ'তে থাকলেও মার্কিন ছবি এখনও আমাদের দেশে আসছে যথেষ্ট, এবং সে গুলো আমাদের দেশী ছবির চেয়ে কোন অংশে কম আকর্ষণ করে না—বরং বেশী। বীমা কম্পানী যেমন ব্যবসা বিস্তারের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে ব্রাঞ্চ খোলে, ম্যানেজিং এজেন্সী রাখে, বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মার্কিন সিনেমা কোম্পানি ও তেমনই আমাদের দেশে নিজেদের সিনেমা গৃহ নির্ম্মাণ করেছে। শুধু তাই নয়, দেশ বিদেশের অভিনেতা অভিনেতৃদের তারা একত্র করেছে, এবং শোনা যায়, বিভিন্ন দেশের জন সাধারণের রুচি অনুযায়ী তারা একই বই নানা ভাবে তোলে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ইয়োরোপের বহু স্থানেই আমেরিকান্ ফিল্ম যাওয়া বন্ধ হয়েছে, ফলে ব্যবসার বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে বর্ত্তমানে মধ্য এবং সুদূর প্রাচীতে। জাপানে মার্কিন ফিল্ম কিছু এখনও যায়, চীনে বিশেষ সুবিধা হয় না, হয় তো মাঞ্চুকুয়োতে কিছু চলে, রাশিয়ায় তো একেবারেই অচল—চলে প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। কিন্তু এই সব দেশে ফিল্ম পাঠাবার সময়

তারা নিজেদের তোলা সব বইগুলোই পাঠায় না। পাঠায় দুজাতের বই—প্রথমতঃ সেই সব বই যে গুলো তারা তুলেছে প্রাচ্যের নরনারীর রুচি এবং টেম্পারামেন্টের দিকে নজর রেখে; আর পাঠায় যে বই-গুলো আমেরিকাতে খুব নাম কিনেছে। দ্বিতীয় জাতের বই পাঠাবার সময় ভাববার কিছু নেই, ভাবতে হয় প্রথম জাতের বেলায়। এমন সব বই পাঠাতে হবে যে গুলো আমাদের রুচিতে খাপ খায়, এমন সামাজিক চিত্র এদেশে আসবে যে সমাজের সঙ্গে আমরা অল্প বিস্তর পরিচিত, অন্ততঃ যার প্রতিচ্ছায়ার একটা প্রতিফলন আমাদের সমাজে দেখা যায়। কিন্তু সেই কারণে আবার বাংলা, মাদ্রাজ, যবদ্বীপ, সান্‌সি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক রুচি অনুযায়ী এক বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ তোলা সম্ভব নয়, কারণ তাতে ব্যবসা চ'লতে পারে না। কাজেই এমন বই তুলতে হবে যাতে সকল প্রদেশের জন সাধরণের রুচিই আঘাত পায়। আর সেই কারণে লক্ষ্য রাখতে হবে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে রুচির ঐক্য কোন্‌খানে, সকল লোকের টেম্পারামেন্টের মিল রয়েছে কোথায়। সেই ঐক্য, সেই সাদৃশ্য আমরা ধরতে পারি কোন্ কোন্ বিষয়ে ওরা ফিল্ম তোলে এবং আমাদের দেশে পাঠায় সেই দিকে একটু নজর রাখলে। সেই জন্যই আমরা ওপরে ছবির কথা বলবার সময় প্রথমেই তার বিষয়ের উল্লেখ করেছি, এবং ভবিষ্যতে বিষয় অনুযায়ী ছবি গুলোকে ভাল ক'রে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। কারণ শিল্পের দিক হ'তে যেমন, ব্যবসার দিক হ'তেও তেমনই ছায়াছবির একটা মূল্য আছে—এবং দুটোই রিলেটিভ্। আমাদের দেশের সিনেমা কম্পানীদের দাঁড়াতে হ'লে এই সব বিদেশী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই দাঁড়াতে হবে, এবং তার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে ওদের প্রযোজক এবং পরিচালকদের মত সূক্ষ্মদৃষ্টির—শিল্প, সাহিত্য, লোক চরিত্র, ব্যবসা, সকল দিকেই। সেইজন্য ছায়াচিত্রের কমার্শিয়াল সাইড্‌কে ভিত্তি ক'রেই আমরা তার ক্রমোন্নতি সিনেমা শিল্পের অগ্রগতি, তার অভিনয়, তার টেক্‌নিক্, প্রভৃতি লক্ষ্য করব। এতে দেশী এবং বিদেশী উভয় প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য, গুণাবলী এবং গলদ ধরা পড়বে, এবং আপনারাও শিল্প এবং ব্যবসা দুভাবেই সিনেমাকে দেখবার সুযোগ পাবেন।

নৃত্য

উদয়শঙ্কর ভারত সংস্কৃতি কেন্দ্র

উক্ত সংস্কৃতি কেন্দ্র ১৯৩৯ সালের প্রারম্ভে স্থাপিত হলেও ১৩৪০-এর আগে নৃত্য-বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। বর্ত্তমানে এই কেন্দ্র আছে রানিধারায়, ভাড়াটে আবাসে। ছাত্রদের জন্যে কয়েকটি ষ্টুডিও তৈরী করা হ'লেও ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ছে। ছাত্র সংখ্যা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ১২, দ্বিতীয় ১০, গ্রীষ্মকালীন সংক্ষিপ্ত পাঠের জন্য ৩০, এ ছাড়া শিক্ষক, কেন্দ্রের সভ্য প্রভৃতি আছেন ২৪ জন। ফলে অনেক প্রবেশেচ্ছুক ছাত্রদের গ্রহণ করতে পারা যায়নি।

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের সরকার সিমতলায় ৯৪ একার পরিমাণ বিস্তৃত জমি কেন্দ্রের স্থায়ী বাস-স্থান নির্ম্মাণের জন্য দান করেছেন। ভারতীয় কৃষ্টির উন্নতির জন্য যুক্ত প্রদেশের সরকারের এই কার্য্যের আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু ষ্টুডিও প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও পুরাতন স্থান হ'তে তাদের স্থানান্তরিত করার জন্য অনেক অর্থের প্রায়োজন। যদিও এখন যুদ্ধের জন্য যে কোন গঠন মূলক কাজ আরম্ভ করাই কঠিন, তা হলেও ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তিরা কেন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবেন বলেই আমাদের ধারণা।

ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে নাটমঞ্চ স্থাপনের ইচ্ছা উদয়শঙ্করের আছে। প্রেক্ষাগৃহ এমন আকারের হবে যাতে অনেক লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়, অথচ তার পরিধি এত বেশী বড় করা হবে না যার ফলে ঘনিষ্ঠ মেলা মেশায় বাধা জন্মাতে পারে। নাচ, কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীত, নাটকাভিনয় এবং শিক্ষা-মূলক উচ্চাঙ্গের শিল্পবিশিষ্ট ছায়াচিত্র—সবই এখানে চলবে। আসনের মূল্যও এত বেশী করা হবে না যাতে সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য হ'য়ে উঠে। অর্থ সংগ্রহের সঙ্গে ষ্টুডিও প্রভৃতি সিমতলায় স্থানান্তরিত হলেই প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার ইচ্ছা উদয়শঙ্করের আছে।

চিত্রদূত

> "বড় কায হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তে যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য।"
>
> —বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

শ্রীমধুসূদন লিখেছিলেন : 'ভেদি অভ্র মঠচূড়া উঠিল আকাশে।' শ্রীচিত্তরঞ্জনের স্মৃতিসৌধ অভ্র ভেদ ক'রে আকাশে উঠেছে। আজকের মতো এমনি এক আষাঢ়ের দিনে চিত্তরঞ্জনের অন্তর্ধান ঘটে। সেই দিনটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্যে আবালবনিতাবৃদ্ধ সেই স্মৃতি-মন্দিরের মূলে মিলিত হ'য়ে চিত্তরঞ্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। চিত্তরঞ্জন দেশাত্মাবোধের ও জাগরণের যে বীজ বপন ক'রে গেছেন, তার আলবালে জল সেচন ক'রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায় ক'জন? নিতান্ত দলে প'ড়ে যেটুকু ক'রে থাকি, সেইটুকুই যেন আমাদের বিস্তর করা হ'লো। আষাঢ় বাঙলার পক্ষে স্মরণীয় মাস। প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ ও প্রবল জলধারাপাত সঙ্গে এনে কবিতা রচনার উপযোগী মসৃণ আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে ভাবালু বঙ্গদেশে প্রবল প্রভাব বিস্তার ক'রেছে এই আষাঢ় মাস। যখন জানলার শার্শিতে বৃষ্টির জলতরঙ্গ সুর বেজে ওঠে, তখন অন্ধকার ঘরে ব'সে আমরা 'এমন দিনে তা'রে বলা যায়...' বলে গান গেয়ে উঠ্‌তে অবশ্যই রাজি আছি। এ গেলো সৌখীনতার প্রশ্ন। এ ছাড়াও আর একটা দিক আছে : সেটা কর্তব্যবোধের। আমাদের নানাবিধ কর্তব্যের মধ্যে দেশের পুরোগামী ব্যক্তির পন্থা অনুসরণ করা একটি অবশ্য করণীয় কাজ। অনুসরণে আমরা তেমন রাজি নই, অনুকরণে সিদ্ধহস্ত। বিশ্বাস না করেন, তবে অনুগ্রহ ক'রে কবিতার লীলানিকেতন বাঙলাদেশের প্রবলপ্রতাপ কবিদের রচনা পাঠ করুন্। শ্রীমধুসূদনও অনুসরণ ক'রে বড় হ'য়েছেন, অনুকরণ ক'রে নয়। এমনি এক আষাঢ়ে আজ কত বছর আগে তাঁর তিরোভাব ঘ'টেছে। আজও তাঁর স্মৃতি মলিন হ'লোনা, বরং তিনি ক্রমশই আমাদের মন জয় ক'রে নিচ্ছেন! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে অভ্রভেদী চূড়া নেই। আজ একই সঙ্গে দুইজন বিদ্রোহী ও কবির কথা বলার সুযোগ পেয়ে সৌভাগ্য বোধ করছি। শ্রীমধুসূদন কেবল কবি নন্, তিনি বিদ্রোহী ; শ্রীচিত্তরঞ্জন কেবল বিদ্রোহী নন্, তিনি কবি। কবিতার সঙ্গে বিদ্রোহিতার এবং বিদ্রোহিতার সঙ্গে কবিতার এমন পরিমাণমত সংমিশ্রণ আর কখনো ঘটবে কিনা জানিনে।

●

কিন্তু কবিতার সঙ্গে বিদ্রোহিতার সংমিশ্রণের হাস্যকর চেষ্টা এখানে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। গতানুগতিক নিয়ম ভঙ্গ ক'রে নূতনত্ব আনার আপ্রাণ চেষ্টা আমরা হামেশাই দেখতে পাই। পায়ে বুট, গায়ে গেঞ্জি, পরণে লুঙ্গি এবং মাথায় শোলার টুপী দিয়ে রাস্তায় বার হওয়াও সাহস এবং নূতনত্ব দুই-ই জাহির করে। বিভিন্ন বিষয় আহরণ ক'রে তা'কে পাশাপাশি বসানোটা ক্ষমতার পরিচয় নয়, যদি তাদের দিয়ে একটা উপকারী কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড তৈরী করতে পারি, তবেই বাহবা পাবার দাবী থাকে। মধুসূদনের কাব্যে মিল্টন বায়রন সেক্সপীয়র সকলেই আছেন কিন্তু কাউকে চেনার উপায় নেই,—সকলের পরণে ধুতি পাঞ্জাবী এবং চেহারা বঙ্গীয়। বালি আর চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে দিতে সামান্য শিশুও পারে—সেই শিশুসুলভ চপলতার যুগ এটা : মেকানিক্যাল মিক্শ্চারে কবিতাকুঞ্জ ঠাসা। কেননা, কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড বানাতে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দরকার। আলাদা আলাদা ভাবে পটাসিয়াম (=K), কার্বন (=C) এবং নাইট্রোজেন (=N) তেমন মারাত্মক নয়, কিন্তু এই তিনটি নিরীহ পদার্থকে পরিমাণ মত যদি মিশ্রিত করা যায় তাহ'লে যে মারাত্মক দ্রব্যটি (=KCN) আবিষ্কৃত হয়, শুনেছি তার স্বাদ নাকি মিষ্টি ; তবুও যে তার স্বাদ একবার নিয়েছে তা'কে জিজ্ঞাসা করলেই তার বিস্তারিত বিবরণ আপনারা পেতে পারেন। মধুসূদনের কাব্যও এইরূপে বিষভাণ্ড হ'য়েছে। যে একবার এর স্বাদ নিয়েছে, চিরকালের জন্যে তার রক্তে রক্তে এই বিষ প্রবাহিত হ'তে থাকবে : এর স্বাদও নিশ্চয়ই মিষ্টি, তা না হ'লে এই বিষভাণ্ডকে মধুভাণ্ড আমরা বলি কেন ?

●

মধুসূদনকে এই মধুভাণ্ড পরিপূর্ণ করতে বিস্তর মেহনত করতে হ'য়েছে। 'অনাহারে অনিদ্রায় সঁপি কায়ঃ মন' তিনি চিন্তা ক'রেছেন, চেষ্টা ক'রেছেন। এই কৃচ্ছ্রসাধনার পুরস্কার তিনি অবশ্যই পেয়েছেন : আজ এই-যে তাঁর স্মৃতিকে টেনে রাত্রি জেগেই আলোচনা করছি, এ-কেও কবির সেই কঠোর রাত্রি-জাগরণের ও অনাহারের পুরস্কার বলতে পারা যায় বই-কি। এত কষ্ট স্বীকার ক'রেও যখন তিনি হাতে-হাতে তার পুরস্কার-স্বরূপ টাটকা কিছু পেলেন না, তখন অবশ্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি ব'লেছেন : 'এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায় ?' এ খেদ নিছক অর্থনৈতিক খেদ, তিনি জানতেন তাঁর পরিশ্রম তাঁকে কি ফল দেবে। তাঁর ক্ষমতার ওপর তাঁর বিশ্বাস যদি না থাকতো, নিজের রচনার ওপর তাঁর আস্থা যদি না থাকতো তাহ'লে তাঁর মুখ দিয়ে 'England does not want a black Macaulay or a black Shakespeare'—নামক দুঃসাহসিক সত্য কথাটি বা'র হ'তো না। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও তেজী কবি। উপস্থিতকালেও যদিও অনেক

নির্ভীক ও তেজী কবি আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে আছে : তাঁরাও অবশ্য নিজেদের কালো-পাউণ্ড বা কালো-অডেন ব'লে মনে ক'রে থাকেন। সেক্সপীয়রের সঙ্গে পাউণ্ডের যে তফাৎ, কুমীরে আর টিকটিকিতে যে-তফাৎ—সেটুকু পার্থক্যও যদি মধুসূদনের সঙ্গে এই কবিকুলের থাকতো, তাহ'লেও তা'কে বাঙলার পক্ষে একটা শুভ লক্ষণ ব'লে ধ'রে নিতে পারতাম। বঙ্গীয় সংস্করণ এজ্‌রাঅডেনেরা বাঙলা (তথা ভারতবর্ষ) কতটা অধঃপতিত দেশ, পরাধীনতার কতখানি নিকৃষ্ট কোঠায় এসে ঠেকেছে—তাঁদের কবিতা মারফৎ তা-ই প্রচার করছেন বলা চলে। বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট, নিজস্ব আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ কিছুই যেন নেই—সব জিনিষের জন্যে মুখ ব্যাদান ক'রে ব'সে থাক্‌তে হ'বে এক অচেনা অজানা দেশের অধিবাসীর দিকে, কখন তাঁরা হোটেলের জানলা দিয়ে ভুক্তাবশিষ্ট একটুকরো হাড় ফেলে দেবেন, সেই হাড় নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি করবো। অবস্থা অনেকটা এই রকম। নানারকমের ট্যাক্স দেশে বসেছে, এমন-কি সেল-ট্যাক্স চালু হ'য়ে গেলো—অনারেবল্ মিস্টার ফজলুল্ হক্ কি তাঁর দেশের প্রকৃত কল্যাণের জন্যে কবিতার ওপর কোনো রকম একটা ট্যাক্সের ব্যবস্থা করতে পারেন না ? যখনি অন্ধকারের আবির্ভাবে আমাদের দু'চোখে কিছু দৃষ্টিগোচর হয়নি, তখনি ত মিস্টার হক্ কোথা থেকে দীপ জ্বেলে দিয়েছেন, আমাদের 'নয়নে দরশ' এসেছে ! আমরা সানুনয় প্রার্থনা করছি, হে অন্তর্যামি অনারেবল্ মিনিস্টার, দেশের কল্যাণের চেষ্টা দেখতে ক্ষতি কি ? শ্রীচিত্তরঞ্জন তাঁর অন্তর্যামীকে যে-ভাবে কল্যাণকররূপে প্রকাশ ক'রেছেন, আমরাও ঠিক সেইভাবে মিস্টার হক্‌কে দেখতে রাজি—অবশ্য, যদি তিনি কল্যাণপ্রদ পূর্বোক্ত কাজটি করে উঠতে পারেন।

●

সুধু কবিতা ব'লে কেন—বুদ্ধির বা প্রতিভার যে-কোনো কাজেই আজ ভেজাল ঢুকেছে। ক্ষমতা জিনিষটা এমনই লোভনীয় পদার্থ-যে যার বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নেই, সে-ও ক্ষমতাবান্ ব'লে প্রচারিত হ'তে চায়। আমাদের চিত্র দেখুন : টাটকা কতগুলো ভুঁইফোড় শিল্পীও আপনারা দেখতে পাবেন, তুলি দিয়ে রং দিয়ে মাখামাখি ক'রে যদি একটা কিম্ভুতকিমাকার পদার্থ দাঁড়িয়ে যায় তাকে একটা নামে ডেকে মর্যাদা বাড়াবার জন্যে হয়ত তাকে 'Lunarism' আখ্যা দেওয়া হ'লো। সাধনা নামক একরকমের অ্যাসিড আছে, সেই অ্যাসিডে আকণ্ঠ ডুবে থেকে নিজেকে শোধন ক'রে নিতে হবে—তারপর আরম্ভ হবে প্রকৃত কাজ। আজ ভেবে ঠিক করলাম, কাল থেকে চিত্রকর হবো, রং-তুলি কেনায় যেটুকু সময় খরচ হয়, তারপরই চিত্রকর হয়ে আবির্ভূত হ'লাম—চিত্রকার্য অমন শস্তা ব্যবসা হয়ত নয়। এখানেও

অনাহার অনিদ্রা দ্বারা নিজেকে স্বচ্ছ করে নিতে হবে। চিন্তা ও চেষ্টার ঘর্ষণে মনের ওপর পালিশ আনতে হবে। অনেক ত্যাগ অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে এই ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার লাভ করা যায়। এই সংখ্যায় শিল্পী প্রমোদকুমারের প্রবন্ধে আপনারা আমাদের উক্তির সমর্থন পাবেন। তিনি যদি শিল্প দিয়ে নিজের অন্তরাত্মাকে জারিত না করতেন, যদি তাঁর শিল্পের ওপর এই সহজ অনুরাগ না থাকতো, যদি তিনি শিল্পোন্নয়নের জন্যে জীবন উৎসর্গ না করতেন, তাহ'লে আজ তিনি হয়ত কোনো ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার হয়ে বিশাল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হতে পারতেন। কিন্তু তিনি জন্ম-শিল্পী—শিল্পকে তিনি ছাড়লেও শিল্প তাঁকে ছাড়েনি, আজ তাই তিনি শিল্পীসম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের জন্যে শ্রদ্ধেয় আসন তৈরী করে নিতে পেরেছেন। হয়ত তিনিও সখেদে বলেন: 'এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়?' কিন্তু তাঁর খেদও মধুসূদনের মতই অর্থ নৈতিক।

●

অর্থনৈতিক খেদ কে না করে? অর্থের পিপাসা কার কবে মিটেছে? যদি শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার শিল্পী-প্রমোদকুমার না হ'য়ে ব্যাঙ্কম্যানেজার-প্রমোদকুমার হ'তেন তাহ'লেও তাঁর অর্থ নৈতিক খেদ ঘুচতো না। অভাব কার নেই? ধরুন, দু'টি লোক আপনার সম্মুখে করুণ মুখে এসে দাঁড়াতেই আপনি ব'ললেন: 'কী খবর?' সমস্বরে দু'জনে ব'লে উঠলো: 'ঘোরতর অভাব।' আপনার প্রশ্নের উত্তরে প্রথমজন ব'ললো, 'আজ পাঁচ দিন সপরিবারে উপোসী আছি।' আপনি দ্বিতীয় জনের দিকে তাকাতেই তিনি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ব'ললেন: 'পেট্রোল। টাকার অভাবে দু'দিন মোটারের পেট্রোল কিনতে পারিনি।' দু'জনেই, বলা বাহুল্য, অভাব-ক্লিষ্ট। এক্ষেত্রে তাই আমরা অভাবকে উহ্য ক'রে রাখতে চাই। শিল্পী প্রমোদকুমার তাঁর নিজের জীবনের কথা-ই যে কেবল ব'লেছেন, এমন নয়। প্রকৃত গুণী যাঁরা তাঁদের সকলের জীবনের সুর তাঁর প্রবন্ধটিতে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে। পেলিটিতে পেলেট উড়িয়ে, ক্যাসানোভায় ক্যাবারে দেখে, মুখে ম্যানিলা ঝুলিয়ে যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেন, তুলিতে-রঙে খেলা করেন—তাঁরা সৌভাগ্যবান। কিন্তু যাঁদের মধ্যে প্রকৃত ক্ষমতা আছে, তাঁদের যেন অনুরূপ জীবন যাপনের দুর্ভাগ্য না হয় ক্ষমতাকে ম্যানিলার ভেতর দিয়ে ধোঁয়া ক'রে যেন তাঁরা বার করে না দেন! দারিদ্র্যের পাঁকে আকণ্ঠ ডুবেও আমরা সগর্বে যেন বলতে পারি: 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!'

●

সর্বভুক নামক যে আগুন আছে, দারিদ্র্য নামক আগুনের কাছে সে কিছু না!—এর তাপ সর্বভুকের চেয়ে শতগুণে বেশি —অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এ-কথা স্বীকার করেন। এই তাপে পুড়তে আমরা রাজি না হ'য়ে পারিনে—দারিদ্র্যের সঙ্গে একটা non-aggression প্যাক্ট করতেই হয়, কেন-না প্যাক্ট না করলেও তো তাকে রুখতে পারবো না! তার শক্তি যে জর্মান বাহিনীর মতো! অতএব নাম স্বাক্ষর ক'রে তার বশ্যতা স্বীকারে আমরা সহজেই রাজি হ'য়ে যাই। এবং ধীরে ধীরে তার শোষণ সহ্য করতে থাকি। কিন্তু এই শোষণের ফলে আমাদের মধ্যের অনেক ক্লেদ হয়ত উবে যায়: হয়ত নিশ্চিহ্ন হবার আগে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে শোধিত অবস্থায় পাই। সেই স্বর্ণমুহূর্তটির সুযোগ নিয়ে আমরা হয়ত কোনো-একটা দাগ কেটে যেতে পারি। সেই টুকুই আমাদের জীবনের পরম লাভ। "ছুটন্ত তারার মতো আলোকের রেখাঙ্কন করি'—আমি যেন নীলিমায় নীল হ'য়ে মরি।"—নিজের প্রবন্ধে স্ব-রচিত লাইন জুড়ে দেওয়ার ঔদ্ধত্য পাঠকবর্গ উপেক্ষা করবেন ব'লে ভরসা করি।

●

মিস্ র‍্যাথবোন নামক মহিলাটির খোলা চিঠির সাফ জবাব রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপ্ত তেজের পরিচয় দিয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সে, তদুপরি রোগশয্যায় শুয়ে, তিনি এই সুগম্ভীর তেজ কোথা থেকে সঞ্চয় করলেন ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। অপমানিত না হ'লে জাতির জাগরণ হয়না—ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মিস্ র‍্যাথবোনের অপমানকর ভাষায়—বৃদ্ধের শিরাতে যৌবনোচিত রক্তের স্রোত ফিরে এসেছিলো, তাঁর দেশাত্মবোধ তাঁকে মুহূর্তের জন্য বোধ হয় তাঁর যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সেই অতীতের শক্তি লাভ ক'রে তিনি যে পত্র রচনা ক'রেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার স্থান অবশ্যই থাকবে।

নাচঘর

সুশীল রায়, সম্পাদক

গোপাল ভৌমিক, সহঃ-সম্পাদক   ধীরেন ঘোষ, পরিচালক

ত্রয়োদশ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৮ { পঞ্চম সংখ্যা

নিয়মাবলী

১। বর্ত্তমান সংখ্যা নাচঘরের পঞ্চম সংখ্যা;

২। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নাচঘর প্রকাশিত হয়;

৩। প্রতি সংখ্যার নগদ দাম চার আনা, বার্ষিক সডাক তিন টাকা চার আনা;

৪। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ এবং মৌলিক ও অনুবাদ গল্প উপন্যাস একাঙ্ক-নাটক কবিতা প্রভৃতি রচনা নাচঘরে সাগ্রহে গৃহীত হয়;

৫। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়;

৬। রচনাদি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

বিজ্ঞাপনের হার

কার্যালয়:

৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফান: কলিকাতা ৩১৪৫

টেলিগ্রাম: রিদ্‌ম্‌স্ (Rhythms)

সূচীপত্র

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

দৈব না পুরুষার্থ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

যতক্ষণ অভাব মোচনের শক্তি নিজের হাতে, ততক্ষণ আত্মসম্মান বোধ প্রবল,—অপরের সাহায্য কেউ নিতে চায়না,—বিশেষতঃ ভদ্র ব্যক্তি, শিক্ষিত, গুণবান বলে যাদের অভিমান আছে। আত্মসম্মানে ঘা লাগে যাতে, তা আমরা করিনা। কিন্তু প্রকৃতির এমনই অদ্ভুত নিয়ম যে সমাজে এক জনের সাহায্য না নিয়ে অপরের চলবার যো নেই। এখনকার দিনে লেখাপড়া শিখে, শ্রম এবং ধনতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরাও যেমন বুঝেন ;—লেখাপড়া না শিখে শ্রম আর বুদ্ধি মাত্র সম্বল করে যারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে তারাও একথা তেমনি বুঝে, যেহেতু এটা সকলকারই বুঝবার কথা আর সহজ বুদ্ধিরই বিষয়ীভূত ব্যাপার।

তারপর, এ অবস্থায় আমার বুদ্ধিতে কোনও উপায় দেখতে না পাওয়া যেমন মূঢ়তা আর আত্মসম্মানের পরিপন্থী মনে করে কর্ম্ম অন্বেষণে অপরের কাছে না যাওয়াটাও তেমনি দুর্ব্বলতা। কর্ম্ম অন্বেষণও যে পুরুষার্থ এই সত্য কথাও আমি যেন ভুলেছিলাম। তারপর, বিনা চেষ্টায় যে কাজ হাতে আসে তাকে আমরা দৈব বোলে থাকি। তার ফলে যদি মোটা ধন লাভ ঘটে তাকে আমরা বড় ভাগ্য বোলে গৌরবও করে থাকি। শ্রম জিনিসটার সঙ্গেই আমাদের ভদ্র শিক্ষিত সমাজের এড়াবারই সম্বন্ধ, কাজেই বিনাশ্রমেই পাওয়া ধন ঠিক উপার্জ্জিত না হলেও তা লাভ করা বড় ভাগ্যেরই কথা। আমরা ছবি আঁকি সে একটা পুরুষার্থ,—আবার সেই রচনাগুলি বিক্রি করার চেষ্টা দ্বিগুণ পুরুষার্থ। এই দ্বিগুণ পুরুষার্থ আমাদের নেই বোলেই প্রদর্শনীর সৃষ্টি। প্রকৃতির নিয়মেই এটা হয়েছে,— তাই প্রদর্শনীই আমাদের ভরসা দেয়। কিন্তু তা সংখ্যায় অল্প বোলেই স্রষ্টা শিল্পীদের দুর্গতির অন্ত নেই, নানা উঞ্ছবৃত্তি নিয়ে সংসার চালাতে হয়। তার উপর যদি আবার আমার মত চরম অবস্থা হয়।

তারপর যা হয়ে থাকে,—ভগবান যা করেন, এই ভাবটি—কারণ এর চেয়ে সহজ কিছু আর ঐ অবস্থায় বুদ্ধিতে বা মনে ধারণা হবার নয়,—অলস মনের প্রধান বন্ধু। এখন, যেহেতু আমার আর কোন উপায় নেই, অভাবে, অনাটনে, রোগে, দুঃখে অসহায়, সকল পথ বন্ধ—এখন যদি তাঁর কৃপা না পাই তা হলে আমার সঙ্গে তাঁর যে এতটা গুরু সম্বন্ধ তার কোন সার্থকতা থাকে কি? এটা ফাঁকা বিশ্বাস নয়, আমার জীবনের নানা অবস্থায় নানা ভাবেই

তা অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানেই দাঁড়িয়াছিল। কিন্তু তাতেও ত দেখি মন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

কোনও উপায় না দেখে তখন আবার মনে মনে ভাগ করে ফেললাম,—আমার ঠিক কি কি চাই, যা না হলে চলবে না। সবই ত চাই, আগা গোড়া যা না হলে নয় তা প্রায় তিন, অথবা সাড়ে তিন শোর ধাক্কা, বেশী বরং,—কম ত নয়ই,—চাল ডাল থেকে আরম্ভ করে কাপড় চোপড়—শেষে মুদি গয়লা ইত্যাদি দেনা মিটানো সব নিয়ে। এ সব হয়ে যায়—যদি এক খানা ছবি বিক্রি হয়ে যায়। হায় কপাল! জয়পুর মহারাণীর কাছে ত সেটা প্রায় হয়েই এসেছিল, এমন দুরদৃষ্ট যে তাও ঘুচে গেল। এখন?—দুর্ব্বল, রুগ্ন শরীরে, মন কিছুতেই কোন অবলম্বন না পেয়ে ভগবানেও,—আমার চির দিনের যে সম্বল, সাধনার ধন, আমার সকল অহংকারের বড় অহংকার, আমার একমাত্র যে ইষ্ট—তাতেও বিশ্বাস রাখতে পারছিনা,—যেন সবই গেছে আর আমার কিছুই অবলম্বন নেই এমনই অকুল পাথার।

এখন বিপরীত ভাব আরম্ভ হয়ে গেল। ভগবানই জানেন কেমন করে তখন এই রকমটা ভাবতে পেরেছিলাম। মস্তিষ্কের বিকার ব্যতীত আর কি হতে পারে?—একেবারেই নাস্তিক হয়ে উঠলাম। আমি কখনও তাঁর স্পর্শ পাইনি। আগে, পার্থিব কতই না ব্যাপারে, কঠিন রোগে, শোকে, গভীরতম দুঃখে অত্যন্ত দারুণ বিপাকে তার অনুগ্রহ বোলে যা পেয়েছি তা কাল্পনিক, তা ভ্রম, আসলে তা আমার পুরুষার্থ প্রয়োগেরই ফল, অন্য কিছুই নয়;—ভাবাবেগে তা'কে ঐ রকম দেখে ছিলাম। —এ কি অবস্থা এল আমার। রোগের মধ্যে প্রলাপের মত কত রকমের কত বিফল চিন্তা ও কত রকম বিরুদ্ধ ভাবে অন্তর ক্ষেত্র তোলপাড় করতে আরম্ভ করলে। একই মনে আমার একবার কিছুক্ষণ প্রার্থনা, কৃপার প্রার্থী হয়ে নিবিষ্ট চিত্ত হবার চেষ্টা, আবার পরক্ষণেই- একি বাজে কথা চিন্তা করে অন্ধকারে হাঁৎড়ে মরচি। কার কাছে চাইচি? তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?— যার অস্তিত্বই তখন সন্দেহের কথা,—তার কাছে প্রার্থনা?—পাগল মানুষের ধারাই ত এই, অনর্থক বলে অনর্থক ভাবে। তবে?

আবার ভাবছি যদিই বা এই বিশ্বের মধ্যে একজন ঈশ্বর বোলে কেউ থাকে,—আমার মত জীবের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? বিরাট বিরাট,—ধ্যান জ্ঞান বুদ্ধির অতীত বস্তুর সঙ্গে কখনও কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে কি কারো — অভাব আমার পথিব বিষয় বস্তুর, তিনি অপার্থিব বস্তু, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটে কেমন করে? তারপর আমার চাওয়া, বার বার অভাব মোচনের জন্য প্রার্থনা, চাওয়া অর্থাৎ হাত পাতা। লজ্জা করে না—

বার বার চাইতে? থাক তাঁর অসীম ধন ভাণ্ডার;— তা বলে বার বার চাওয়া? মন, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যাদি নানা বিষয়, সুস্থ শরীর মন, যা নিয়ে লক্ষ কোটি জীব তাঁর এখানে কত রকমে করে খাচ্ছে,—উপার্জ্জনের দ্বারা নিজেকে গৌরবান্বিত করচে নিজ শক্তির সদ্ব্যবহার করে, কত লোকের আশ্রয় স্থল হয়ে. তাঁর পূর্ণ আশীর্ব্বাদের অধিকারী হচ্চে—। আমার সেই সব থাকতেও তাতে কেন বঞ্চিত? আমিই বা কেন এমন অসহায় হয়ে পড়েছি? আমার অভাব কেনই বা আমি মোচন করতে পারি না?

নিশ্চয় কিছু গলদ আছে আমার কর্ম্মপন্থায়! কিন্তু কি গলদ? কি ত্রুটি আমার কর্ম্মে, চিন্তায় এবং ব্যবহারে?—ভেবে ভেবে ভাবনাই চললো বেড়ে, সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা কিছুই হোতে চায় না। কেন এ ভিক্ষা বৃত্তি?—কেন আমি এতটা শক্তির অধিকারী হয়েও এতটা অক্ষম?—এটা কি সাময়িক রোগ, দুর্ব্বলতা? না যথার্থই আমার শক্তিহীন অস্তিত্ব,— যার দ্বারা আমার আর কিছুই হবার নয়!

নাঃ, আমার আর কোন দিকেই পথ নাই! যে বস্তুকে এক সময়ে আমার জীবনের প্রিয়তম, যার চিন্তাই আমার জীবনের চরম সার্থকতা মনে করে এসেছি: এতক্ষণের স্পর্শের অনুভূতি নিয়ে দিনের পর দিন নিঃসঙ্গে, নিদ্রাহীন চক্ষে অতুলনীয় আনন্দে কাটিয়েছি;—আজ সেই বস্তুর উপর এমনই আস্থাহীন হয়েচি যে তার সম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তায় শান্তি পাওয়া দূরের কথা তার চিন্তায় অন্তর তিক্ত হয়ে উঠছে। আজ তার সম্বন্ধে আমার মনের এইবিচার, নিঃসঙ্কোচেই মনের মধ্যে হয়ে গেল, কিছুমাত্র বাধা পেলনা। তাও দেখচে বসে বসে সেই আমি!

অন্তর ক্ষেত্র এই ভাবেই তোলপাড় করতে লাগলো,—ক্রমে এমনই ছট্‌ফটানি আরম্ভ হলো সে অস্থিরতার সঙ্গে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটার যে সংঘাত তা সহ্য করা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু ছাড়বে কে, সহ্য করতেই ত হবে। মাথা দিয়ে আগুন ছুটতে লাগলো।

কেমন করে বাড়ি ঢুকবো, কোন একটা ব্যবস্থা না করে? কোন স্থান এমন নেই যেখানে আশা নিয়ে যেতে পারি। শরীরেও আর যেন বল নেই। সকল দিকেই আমার পুরুষার্থ আজ বিফল। দৈব ব্যতীত আর উপায় নেই। কিন্তু দৈবই বা কোন দিক থেকে কাজ করবে! চিন্তার স্রোত এবার অন্য পথ ধরলে।

এ অবস্থাই বা আর কত সহ্য করা যায়; আর কি ভাল দিন কখনও আসবে? আর সে ভরসা নেই। কাজেই, আমার দ্বারা সংসারের আর যে কোনও উপকার হবে তার সম্ভাবনাই নেই,—কারণ সে আশাই নেই। আশাতেই মানুষ ত বেঁচে থাকতে চায়! সে আশাই যখন আমার নেই, তখন কেন আর বেঁচে থাকবার অশান্তি। এই এখনই ত ঠিক সময়,—যখন এ কাজে কোন পাপ নেই, কোন প্রত্যবায়ও নেই।

ব্যবস্থা করবার কিই বা আছে আমার? সম্পত্তির মধ্যে আমার আছে কতকগুলি ছবি। নূতন পুরাতন, প্রত্যেক খানিই আমার প্রাণের জিনিস,—আমার চিন্তার ফল, সাধনার ধন। এক সঙ্গে সব গুলির দাম খতালে চার থেকে পাঁচ হাজার হবে; তা ছাড়া ড্রইং আছে অসংখ্য তারও একটা মূল্য আছে। যদি এক সঙ্গে সবগুলি কেউ নেয় তাহলে হাজার টাকায় আনন্দে দিতে পারি,—দিয়ে উদ্ধার হয়ে যাই। কিন্তু পোড়া কপালের ভোগ যে ভাবে চলেছে তাতে কেউ তা 'নেবে কস্মিনকালে, বিশেষতঃ আমার জীবিত কালে,—তার যে কোন সম্ভাবনই নেই। যেচে বাড়ী বয়ে বিক্রি করতে যাওয়ার যে অভিজ্ঞতা তা যে বড়ই দুঃখের! উৎকৃষ্ট একটি সৃষ্টি, বেশ বড় ছবি, একজিবিসনে তার দাম পাঁচশো টাকা ছিল একবার দায়ে পড়ে মার্জ্জিত, সভ্য-ভব্য এক পরিচিত ধনী ব্যক্তির বাড়ি বয়ে বিক্রি করতে গেলাম। তিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেন বড় চমৎকার। 'পঞ্চাশ টাকা হয়ত রেখে যান, যখন নিয়ে এসেছেন ঘাড়ে করে।' ঠিক এই কথাগুলি স্বকর্ণে শুনে আস্তে আস্তে যখন চলে আসচি তখন আবার বললেন,—'টাকার সে রকম দরকার হয়নি বোধ হয়? না হোলে ওটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান ঘাড়ে করে?'

প্রাণের জিনিস, গায়ের রক্ত যেমন আমার—তার প্রতি আর একজনের এই ব্যবহার! আঃ—এ অপমান অসহ্য। তবে আমার বিশ্বাস আছে যখন আমি থাকবো না তখন কোনও যথার্থই বন্ধু আমার পরিবার বর্গের দুঃখ, দুরবস্থার কথা শুনে আমার এই কাজগুলি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করে হয়ত আমার অসহায় আত্মীয়বর্গের হাতে তুলে দিবে কিছু টাকা। কিন্তু আমাদের দেশে এর অপর দিকটাও আছে, স্থান বিশেষে তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অসহায় পেয়ে যদি ফাঁকি দেয়? এমনও হতে পারে উত্তম সহৃদয়তা দেখিয়ে বড় যত্নে ছবিগুলি নিয়ে গেল,—কিন্তু তারপর আর কোন সম্বন্ধই রাখলে না। না মূল্য, না ছবি প্রত্যর্পণ। দুঃস্থ পরিবারবর্গের ব্যাকুল পত্রের পর পত্রের কোন উত্তরই এলো না। কারণ সে ঠিক জানে,—অসহায় পরিবার,—প্রতিকারের জন্য কখনও রাজদ্বারে অভিযোগ আনতে পারবে না। যেহেতু এখনকার দিনে প্রতিকারের জন্য আদালতে যাবার আগে এক কাঁড়ি টাকা ঢালতে হবে। উকিল বা আইন ব্যবসায়ীদের পেট ভরানো চাই-ই: তারপর শেষে চতুর পক্ষেরই জয়,—এতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায়ের কোন বালাই নেই, এমনই ন্যায় পরায়ণ রাজ্যে আমরা বাস করি। এখানে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যেমন রোগের প্রতিকারের জন্যও তেমনি আগে পয়সা ঢালতে থাকু, বিনা বাক্যব্যয়ে, বৈজ্ঞানিক আবিস্কার এবং উন্নত পদ্ধতির সম্মান রক্ষা করে,—ফলাফলের কোন প্রশ্নই কোরোনা। তারপর আমার ভাগ্যে কি ঘটবে তা

শেষে বুঝা যাবে। তুমি যদি আগে অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে সঙ্কোচ কর বা প্রশ্ন কর বা ফলাফলের বিচার কর তবে তুমি একটা সেকেলে ভূত, মূর্খ—ব্রেনলেস আর ওয়ার্থলেস গর্দ্দভ।

মনে আমার সকল কথাই এই ভাবে ওঠে ভেসে, একএকটা ছবির মত রূপ দেখিয়ে আবার ডুবে গেল। কি ব্যবস্থা করতে পারি, আমার কিই বা শক্তি আছে। তখন ত আমি কিছুই দেখতে আসবো না, যা হবে, বিধাতার বিধানেই হবে। আমি কিছু পাকা ব্যবস্থা করতে গেলেই কোন দিক দিয়ে ভুল হয়ে কি ফল উৎপন্ন করবে তা কি আমি জানি ?— আমাদের মত একজনের বুদ্ধি ! হায়রে,—এই আমার বিষয় আর ঐ তার ব্যবস্থা !

কয়েকটা লেখাও আছে, আজ কাল লিখতে প্রবৃত্তি বেড়েই চলেছিল। কিন্তু লেখার বদলে টাকা পেয়ে অভাব মোচন হবার সৌভাগ্য আমাদের এদেশে,—এ সমাজে, এই সব প্রকাশকদের খর্পরে পড়লে হবার যে কোন সম্ভাবনাই নেই,—এ কথা ত সকলকারই জানা। কাজেই সে দিক দিয়েও কোন উপায় নেই ;—তা ছাড়া দু পাঁচ দশ টাকায় ত কোন উপায়ই হবার নয় যখন, তখন আর ভাবনার কিছুই ত নেই।

নাঃ শেষ, এ খেলা শেষ করে দেওয়াই ঠিক ; মরণই চাই আমার, আর বিধাতারও অভিপ্রায় তাই,—না হলে এতটা উৎসাহ কেন, এ কাজের প্রথম চিন্তা থেকেই এ যেন প্রেরণা ? এ সংকল্প স্থির হয়ে গিয়েছে যখন, আর বাড়িতে ফিরে যাবার কোন দরকারই নেই। স্টুডিওতে যাওয়া,—একখানি পত্র লিখে রাখা, তারপর কি উপায়ে যে শেষ কাজটি সমাধা করতে হবে সেটা লেখা বা কাকেও বলবার নয় সে কথা,—সে আমার সম্পূর্ণ নিজের গোপন অধিকার।

পয়সা নেই, হেঁটেই স্টুডিওতে চলেচি। শরীর এত দুর্ব্বল, পা মাঝে মাঝে থর থর করে কাঁপচে। কিন্তু মনে খুব জোর,—স্টুডিওতে পৌঁছে যাবো, না হয় এক ঘণ্টা লাগবে। একবার তিন-কোণা পার্কে আর একবার রাস বিহারী এভনিউ আর রসা রোড সাউথের মোড়ে কতক্ষণ বসে স্টুডিওতে পৌঁছালাম, তখন ন'টা হয়ত বেজেচে। বাড়িতে আজ আর যেতে হবে না, মুক্তি আমার আছে, আর কোন কাজই নেই। স্টুডিওতেই আমি চরম শান্তি পাবো। আঃ—লোকে যা বলে বলবে, এ হবে আমার আত্ম বিবর্ত্তন জীবনের সকল ভার নামাবার, মুক্তির আনন্দ,—আমার সুমুখে !

দেখি গেটটা খোলা, ওখানকার পিয়ন—চিঠি ছিল বোধ হয়,—বাক্সতে ফেলে বেরিয়ে আসচে। সেলাম করতেই জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠি পত্র কিছু আছে না কি ?

দু'খানা চিঠি বাক্সতে ফেলে সে চলে গেল।

তাড়াতাড়ি ঢুকেই বাক্স থেকে চিঠি দু'খানা বার করে দেখি একখানা বড় আর

মোটা খাম, উপরে ছাপানো লাইন, এচ, এচ, মহারাজা অফ্ জয়পুর স্টেট্ সারভিস্। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি একখানা ফরোয়াডিং নোটের সঙ্গে সাড়ে তিন শো টাকার একখানা ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের চেক্।

চিঠির মধ্যে জয়পুরের মিলিটারী সেক্রেটারী লিখেছেন,—তরুলতা ছবিখানি ভূল ক্রমে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এই সঙ্গে তার পুরা দাম পাঠানো গেল, অবিলম্বে সেখানি এখানে পাঠিয়ে দিবেন আর টাকাটা প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

*　*　*　*　*

মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো, থর থর করে হাত কাঁপচে। বুকের ভিতর ধড়ফড়্ করে কেমন অবসন্ন হয়ে পড়লো শরীর, ভিতরে জ্ঞান আছে,—বসে পড়লাম একখানা চেয়ারে। কতটা ক্ষুদ্র আমি!—তখনও ভাবচি,—এটা কি হোলো?

নাট্যকার দীনবন্ধু

কণাদ গুপ্ত

বাংলা থিয়েটারের গোড়ার দিকে মধুসূদনের নাটক গণ্যদের খোরাক জোটালো বটে, কিন্তু গণ সেই যাত্রার কোঠাতেই পড়ে রইল, কারণ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকে পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যে বিপুল ব্যয় অবশ্যম্ভাবী তা বহন করার মত শক্তি বাংলা দেশের গণের নেই।

এদের গতি করলেন দীনবন্ধু। লিখছেন গিরিশচন্দ্র, 'শাস্তি কি শাস্তির' উপসর্গ পত্রে, আপনার (দীনবন্ধুর) সমাজচিত্র সধবার একাদশীতে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই।··· মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

দীনবন্ধুর সব চেয়ে প্রথম, সব চেয়ে নাম করা এবং বর্ত্তমান লেখকের মতে, সব চেয়ে দোষযুক্ত নাটক নীলদর্পণ। বাংলার চাষীদের ওপর একসময় শ্বেতকায় নীলকরেরা যে অকথ্য অত্যাচার করেছিল নীলদর্পণ তারই দর্পণ। দর্পণ হিসাবে এ নিখুঁত। কিন্তু আর্টের দর্পণ আর বাজারের দর্পণে কিছু প্রভেদ আছে। বাজারের দর্পণ নির্জীব, সকল কিছুকেই প্রতিফলিত করে, বাছাই করে না ; আর্টের দর্পণ সজীব, যা বিদ্ঘুটে, যা অসুন্দর, যা মিলহারা, তাকে বর্জ্জন করে, বুকে ঠাঁই দেয় না। নীলদর্পণ বহুলাংশে বাজারের দর্পণই রয়ে গেছে, আর্টের দর্পণ হয়ে উঠেনি।

নীলদর্পণের আদি, মধ্য, অন্ত সমস্তই দুঃখাত্মক ; দর্শকের কাছে দুঃখকে জমিয়ে তুলতে গেলে মাঝে মাঝে হাল্কা দৃশ্য দেওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। দীলদর্পণে হাল্কা দৃশ্যের একান্ত অভাব। ফলে, দুঃখের অসম্ভব আতিশয্যটাই যেন এক এক সময় হাস্যরসের খোরাক যুগিয়েছে। নবীন মাধব নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। ফলে উড্ সাহেবের চক্রান্তে তার পিতা, বৃদ্ধ গোলক বসু, ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হলেন, এই হোল দুঃখ নং এক ; দুঃখ নং দুই, গোলক কারাগারে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করলেন ; তিন নং দুঃখ, রোগ্ সাহেব গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে ঘুসি মারায় তার গর্ভস্রাব, অসহ্য যাতনা ভোগ এবং মৃত্যু ; উড্ সাহেবের লগুড়াঘাতে নবীনমাধবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি, দুঃখ নং চার ; পরের দুঃখ, নবীনের মা সাবিত্রী পতি ও পুত্রের শোকে উন্মাদিনী

হলেন ; দুঃখ নং ছয়, উন্মাদিনী সাবিত্রী কনিষ্ঠা পুত্রবধূর গলায় পা দিয়ে মেরে ফেললেন ; উপসংহারের দুঃখ, সাবিত্রীর মৃত্যু। অভিনয়ান্তে দর্শকের পক্ষে এ কথা ভেবে বিস্মিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, কোন্ পুণ্যবলে নাটকের বাকী চরিত্রগুলি তখনও জীবিত রইল।

নীলদর্পণের ভাষা থেকেও বেশ বোঝা যায়, সুক্ষ্ম আর্টকে অবহেলা করতে দীনবন্ধু কতখানি ভালবাসতেন। রোগ সাহেব যেখানে ক্ষেত্রমণির উপর বলাৎকার করতে উদ্যত, সেখানে ক্ষেত্রমণির উক্তি ঃ—

"ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মড়া মরে ; মোর গায়ে যদি হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবো ; তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না।"

খুব সম্ভব, বাস্তবের ক্ষেত্রমণি হুবহু এই ভাষাতেই কথা বলে, কিন্তু আর্টের খাতিরে অরুচিকর বস্তুকে ছেঁকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন দীনবন্ধু বোধ করেন নি।

দৃশ্য সংযোজনাতেও তাই। চতুর্থ অঙ্কের একটী দৃশ্যের বর্ণনা এইরূপ ঃ

ইন্দ্রা বাদের জেলখানা গোলকের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়ীতে দোদুল্যমান। গলায় দড়ি দেওয়ার বীভৎস দৃশ্য মঞ্চে উপস্থাপিত করার দুঃসাহস পৃথিবীতে বেশী নাট্যকারের হয়নি। কিন্তু এ দুঃসাহস অর্থহীন। নাটকীয় চিত্রকে অতিমাত্রায় বস্তু ধর্ম্মা করার আগ্রহে দীনবন্ধু মনে রাখেননি যে, রুঢ় আঘাতে মানুষের কোমল অনুভূতিগুলো ভোঁতাই হয়ে যায়, সাড়া দিয়ে উঠে না। বাস্তবিক, উড্‌সায়েবের রাইচরণকে শ্যামাচাঁদা ঘাত, রোগসাহেবের গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে পদাঘাত, ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকী, সাবিত্রী দ্বারা গলায় পা দিয়ে সরলতাকে হত্যা প্রভৃতি দৃশ্য মঞ্চে উপস্থাপিত দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়, দীনবন্ধুর সৌন্দর্য্যবোধ তেমন সুস্থ ছিল না। ভয় হয়, ফ্রয়েডের কোন ছাত্র এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ পেলে দীনবন্ধুকে হয়তো বা 'saidist' আখ্যাই দিয়ে বসতেন।

কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে এসব দোষের কোনটাই মারাত্মক হয় না, যদি সৃষ্ট চরিত্র গুলি সুস্পষ্ট ও সজীব হয়। কিন্তু নীলদর্পণের চরিত্রগুলিতে এই সজীবতার একান্ত অভাব। এর একদল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অত্যাচারিত হওয়া, আর একদল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অত্যাচার করা। এ ছাড়া কোন চরিত্রেরই যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নেই।

অবশ্য নীলদর্পণ দীনবন্ধুর প্রথম নাটক এবং এ রকম একখানা আগা গোড়া ট্রাজেডি লেখার চেষ্টা ও তিনি আর করেন নি, তবু, সমাজ চিত্রকে অশুদ্ধ অবস্থাতেই অঙ্কন করার অভ্যাস তিনি উত্তর কালেও ত্যাগ করতে পারেন নি।

ট্রাজেডি যে তাঁর নিজের ডিপার্টমেণ্ট নয়, একথা দীনবন্ধু নীলদর্পণ লিখেই উপলব্ধি

করেছিলেন তাই তাঁর পরবর্ত্তী নাটকগুলির মধ্যে তিনখানি নিছক প্রহসন, এবং বাকী তিনখানি কমেডি।

নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, কমলে কামিনী এই তিনখানি কমেডিতেই মুখ্য প্লটের পাশা পাশি একটী গৌণ প্লটও রাখা হয়েছে, এবং মজা এই যে, তিন খানিতেই মুখ্য প্লটের চেয়ে গৌণ প্লটটাই হয়ে উঠেছে বেশী মনোহারী। এর কারণ মুখ্য প্লটগুলি ঈষৎ ভারী, serious, এবং তত্রত্য চরিত্র এবং সংলাপ গুলিও বেশ গুরুগম্ভীর; পক্ষান্তরে গৌণ প্লটগুলি সকলই হাস্যরসাত্মক এবং হাস্যরসে দীনবন্ধু লেখনী জলের মাছের মত অনায়াস সঞ্চরণে অভ্যস্ত।

দীনবন্ধুর প্রতিভা আর যাই হোক্ বহুমুখী নয়। দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর জন্য লিখিত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত— সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, তাঁহার মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।"

দীনবন্ধু সম্বন্ধে এর চেয়ে সত্যতর সমালোচনা আর হয়না। ঠিক এই কারণে তাঁর প্রহসনগুলিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা হয়। নিমচাঁদ সাধারণ চরিত্র নয়, অতিরিক্ত মদ্যপান করে সে জীবনের সঙ্গতি বোধ হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক এই কারণেই দীনবন্ধুর পক্ষে তাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়েছে। রাজীব মুখোপাধ্যায় সাধারণ চরিত্র নয়, তার মত বৃদ্ধ বিপত্নীকের পক্ষে বিবাহ করার ইচ্ছা একটা ব্যাধি, দীনবন্ধু এই ব্যাধি গ্রস্থের চরিত্র নিতান্ত সহজে অঙ্কিত করলেন। জামাই বারিকের যে সব ঘর জামাইরা বিনা পাশে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারত না, তারাও সাধারণ নয়, বিদ্রূপচিত্র, তাই তাদের আঁকতেও দীনবন্ধুর তুলি বাধা পায়নি।

এক কথায় দীনবন্ধু ছিলেন পাকা রিয়ালিস্ট—পাকা এবং বেপরোয়া। যা দেখতেন, তার বেশী তিনি আঁকতেও না আঁকতে, চাইতেনও না। ঠিক এই কারণে সেই পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের প্রাধান্যের যুগেও তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকগুলিই সামাজিক। তিনি যতখানি তার চেয়ে বেশী ছিলেন রিফরমার সংস্কারক, বস্তুতঃ তাঁর প্রায় সমস্ত নাটক গুলিই কোন না ছিলেন নাট্যকার না কোন সামাজিক দোষ দূরীকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বর গুপ্তের সৃষ্টি কৌশল ছিল না, কিন্তু দীনবন্ধুর এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের মনে হয়, দীনবন্ধু যে কয়েকটী অপূর্ব্ব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তার মূলে তাঁর

কাব্যপ্রতিভা নেই, আছে সমাজ সংস্কারের তীব্র নেশা। নিমচাঁদকে যে আমরা ভুলতে পারি না, তার কারণ এ নয় যে, দীনবন্ধু চরিত্র স্রষ্টা হিসাবেখুব কৌশলী ছিলেন, তার কারণ দীনবন্ধু মদ্যপানের বিষময় পরিণাম হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং হৃদয় দিয়েই তা দূর করতে চেয়ে ছিলেন। এই কারণে যে সব চরিত্রকে দীনবন্ধু কোন সামাজিক দোষ বা দোষাবলীর টাইপ করে সৃষ্টি করেছেন, শুধু সেইগুলিই কিছু প্রাণবান, বাকীগুলি যেন কাঠের পুতুল।

একটী বিষয়ে দীনবন্ধুর প্রতিভা ছিল অসামান্য, গল্প রচনায়। তাঁর নাটকের গল্প গুলির অনায়াসে গতিভঙ্গী দেখে মনে হয়, ঘটনাগুলি যেন সমস্তই বাস্তবে ঘটেছিল এবং তিনি নিজে তার সাক্ষী ছিলেন। সাধারণতঃ নাটকের নিয়মে কোন গল্পকে বাঁধতে গেলে গল্পের গতির অনেকাংশে ব্যাঘাত হয়, তখন নাট্যকার গল্পকে গতিশীল রাখার জন্য নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হন। কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকে কোথাও এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের চিহ্ন মাত্র নেই। দীনবন্ধুর নাটক একবার পড়তে বা দেখতে সুরু করলে শেষ হওয়ার পূর্ব্বে কোন স্থানে উঠে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। ঘটনার দিক থেকে এই রকম অদম্য আগ্রহের সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই হয়ত চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে তিনি তেমন সফল হতে পারেন নি। এবং চরিত্রাঙ্কনের দিক থেকে সধবার একাদশী যে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এরও একটা কারণ হয়ত এই যে, গল্পের দিক থেকে তা প্রায় শূন্যগর্ভ।

সরল করে নিলে দীনবন্ধুর প্রতিভা হয়ে দাঁড়ায়, ব্যঙ্গবর্ষণের শক্তি, গল্প রচনার প্রতিভা ও সংস্কারকের উৎসাহ। বিশ্বকালের নাটক রচনার পক্ষে এই তিনের সংযোগই যথেষ্ট নয়, এবং দীনবন্ধু বিশ্বকালের কবিও নন্। কিন্তু তবু এ যুগের নাট্যকারেরা তার কাছ থেকে শিক্ষা নিলে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না, বিশেষ করে দু'টী বিষয়ে :—এবং বাস্তবকে ভালবাসায়, আধুনিক নাট্যকারেরা সামাজিক নাটক লেখেন, কিন্তু তার নায়ক নায়িকাকে আমাদের সমাজে খুঁজে পাই না, যে ভাষায় তারা কথা বলে, সে ভাষার সঙ্গে প্রচলিত দেশীয় ভাষার সাদৃশ্য খুজে পাই না, দীনবন্ধুর শিক্ষা ত্রুটী অচিরে দূর করতে পারে। দ্বিতীয়, গল্প বিবৃতির কৌশলে; অনাবশ্যক ভূমিকার অবতারণায় অস্থানে গান দেওয়ায়, যত্র তত্র বক্তৃতা দেওয়ার লোভে গল্পকে স্থাই করায় এবং অকারণ তাড়া হুড়ো করে গল্প শেষ করায় বাংলার আধুনিক নাট্যকারের যেমন পটু, এমন আর কেউ নয়। অসংখ্য বৈদেশিক নাটকের ভারে নিজেদের কল্পনাশক্তিকে অনর্থক জর্জ্জরিত না করে এরা যদি পুরানো যুগের দীনবন্ধুকে এই দুটী বিষয়ে কিছুকাল গুরু করেন, তা'হলে হয়ত প্রেক্ষাগৃহে বসে চার ঘণ্টা অভিনয় দেখা শাস্তির নামান্তর না হ'য়ে আবার আনন্দ লাভেরই উপায় হয়ে উঠবে।

দক্ষিণ কাঁকুলিয়া নারী সমিতি

তারাপদ রাহা

বন্ধুরা বলে, মনোজ, তোর বউ ভাগ্‌গি ভালো, আমরাও ত অনেকে দেখে শুনে বিয়ে করেছি, কিন্তু অমনটি—

মনোজ পাল্টা জবাব দেয়, দু'দিন ওর সঙ্গে ঘর করলে আর তোরা কেউ এ কথ বলতিস না।

গৌরাঙ্গী বলিষ্ঠা শুভাকে আধুনিক সাজে সজ্জিত হইয়া মনোজের সঙ্গে লেকে বেড়াইতে অথবা সিনেমায় যাইতে বন্ধুদের অনেকেই দেখিয়াছে। অনেকে তার হাতের চা-ও খাইয়া গিয়াছে। বউ তার লেখাপড়াও জানে। সুতরাং বন্ধুরা যে মনোজের স্ত্রী-ভাগ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

মেজাজ ভালো থাকলে শুভা মাঝে মাঝে গানও গায়, কাজ করিতে করিতেও অনেক সময় গুণ গুণ করে। সবই ভালো, তবে মুস্কিল করিয়াছে সে কথায় কথায় তর্ক করে। তর্কে যদি তাহাকে যুক্তি দিয়া হারাইয়া দিতে পারিলে তবে ত রক্ষা, নইলে শুভা কিছুতেই তার গোঁ ছাড়িবে না। মাঝে মাঝে মনোজের মনে হয় সে সংসার ছাড়িয়া পলায়। মুখেও সে সে-কথা বলিয়া ফেলে।

শুভা বলে, যাও না,—হিষ্ট্রীতে তোমার নাম লেখা থাকবে। চৈতন্যদেব কৃষ্ণ প্রেমে সংসার ছেড়ে ছিলেন, বুদ্ধদেব জীবের দুঃখ নির্ব্বানের জন্য সংসার ছেড়েছিলেন—আর তুমি ছাড়লে বউয়ের সঙ্গে তর্কে না পেরে। যাও—জগতে তোমার একটা কীর্ত্তি থেকে যাবে।··· তবে একটা কথা বলে রাখছি,—যদি নিতান্তই যেতে চাও কাপুরুষের মত লুকিয়ে লুকিয়ে থেকো,—বীর পুরুষের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালে আমি গিয়ে খোর-পোষের দাবী করে বসবো কিন্তু,—সুতরাং সাধু সাবধান!

কিন্তু কত সাবধান আর সাধু হইবে। বিবাহের পর ক্লাবে যাওয়া তার এক রকম বন্ধ হইয়াই গিয়াছে। ক্লাবে গেলেই শুভা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠে: আবার বাড়ী ফেরা হ'ল কেন,—ক্লাবে রাত কাটিয়ে এলেই ত হত!

মনোজও রাগিয়া যায়: তোমার আঁচলের নীচেই থাকতে হ'বে না কি দিন রাত?

ও মা, সে কথা বলছে কে গো!

সারাদিন আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর একটু জিরুতে পাবো না,—বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দু'টো কথা বলতে পাবো না, দুই খানা বই পড়তে—একটু খেলতে পাবো না আমি, তুমি বুঝি এই কথা বলতে চাও!

শুভা কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া বলে, আমি যদি এমন হ'তাম, পারতে তুমি সইতে?

নিশ্চয়ই, তোমার মত অবিবেচক নই আমি।

আচ্ছা, বেশ —

পরদিন সাড়ে নয়টায় ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনোজ দেখে শুভা বাড়ী নাই। ঘরে তালা দেওয়া। ঠিকা ঝি কাজ করিয়া কখন চলিয়া গিয়াছে। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে সে। বারান্দায় একটা ভাঙা ডেক্‌চেয়ার পড়িয়া ছিল—ছারপোকার কামড় খাইতে খাইতে তাহাতে বসিয়া মনোজ সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে ভাবিতে লাগিল, এত রাত্রে শুভা কোথায় যাইতে পারে!

রাত্রি সাড়ে দশটায় বাড়ী ফিরিয়া শুভা হাসিয়া বলিল, কতক্ষণ এসেছ তুমি?

বেশিক্ষণ নয়, এই দুই চার মিনিট হবে।

ঘরে ঢুকিবার আগে হাত মুখ ধুইতে ধুইতে বলে, মা গো,—মিত্তির বাড়ীর নোতুন বউটার সে কি গল্প, আমাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না, বলে, দিদি, আপনি এলে কত ভালো লাগে, বসুন আর একটু, একটা গান গা'ন।

গাইলে না কি একটা?

আরে ছো:—ওদের বাড়ী গান গাইতে যাচ্ছি আমি। ও আসতে চায়, গান শুনতে, আমাদের বাড়ীই আসতে চায়, শিখবারও ইচ্ছা আছে। তা আমি—'না' করে দিয়ে এলাম,—আমাদের এখানে এসে বসবে কোথায়?

মিত্তির বাড়ীই এত রাত কাটালে?

এত রাত মানে?—চোখ পাকাইল শুভা। তুমি কা'ল কত রাতে বাড়ী ফিরেছিলে?

পুরুষ আর মেয়েতে তফাৎ আছে, শুভা। ভুল বুঝ না আমায়, মানে—

মানে আর বলতে হ'বে না আমায়, মানে আমি বুঝি, সহর বাজারে মেয়েছেলের একা চলা ফেরায় বিপদ আছে—এই ত তুমি বলতে চাও,—তা'লে আমিই বা তোমায় একা অত রাত ছেড়ে দিতে পারি কি করে?

মনোজ হাসিয়া উঠিল : আমিও মেয়েছেলে না কি ?

মেয়েছেলে তুমি নও, কিন্তু পুরুষেরও কলকাতায় রাত্রে অত চলা ফেরা বড় নিরাপদ নয়,--অন্তত আমরা তা মনে করি না।

মনোজ প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিল না, তারপর বুঝিয়া ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, ওঃ — সে সন্দেহও করো না কি ?

সন্দেহ করি না তবে ভয় আছে। শুধু একদিকে সর্ব্বনাশ নয়, অর্থনাশেরও আশঙ্কা আছে এতে !

মনোজ ত্যক্ত হইয়া বলিল : নাও- হয়েছে,—যেও তুমি যেখানে ইচ্ছে, থেক যত রাত ইচ্ছে,—কিছু বলবো না আমি। সত্যিই ত- আমাদের আড্ডা আছে, তোমাদেরই বা থাকবে না কেন ?…যেও।

শুভা কাছে আসিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, রাগ করলে, লক্ষ্মীটী, রাগ করো না।…তুমি আমায় ফেলে দূরে দূরে থাকলে আমারও ঠিক এমনি লাগে।

মনোজের রাগ পড়িয়া আসিয়াছে। শুভা তাহাকে ভাত দিয়া নিজে ভাত বাড়িয়া খাইতে খাইতে বলিল, সত্যি বড় কষ্ট লাগে গো—

মনোজ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল।

সত্যি, মানুষের যে কত কষ্ট,—আজ তুলসীর মার ওখানেও গিয়েছিলাম,—দেখি ছেলেটাকে নিয়ে তেঁতুল আর লঙ্কা ডলে ভাত খাচ্ছে।

মনোজের দুই চোখ কপালে উঠিল। মাখা ভাত পাতে রাখিয়া সে বলিল, তুলসীর মা মানে আমাদের সেই ঘুটে-ওয়ালীর বাড়ী গিয়েছিলে তুমি ?

কেন, তাতে কি দোষ হয়েছে,—পলানীর বাড়ীতেও গেছি, সন্ধ্যাবেলা রেঁধে বেড়ে অনেক জায়গায় বেড়িয়েছি আজ।

স্বামীর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া—শুভা কৌতুক বোধ করিতে লাগিল।

এ পাড়ায় ক'ঘর ভদ্র গেরস্থ আছে ?—ওইত মিত্তির বাড়ী, মুখুজ্জে বাড়ী আর দত্ত বাড়ী। বস্তিতে ওদের কাছে গেলে দোষ কি ?…তা'ছাড়া ওদের যা প্রাণ আছে, তা তোমার ঐ মিত্তির মুখুজ্জে বাড়ীর মেয়েদের নেই…কি রাগ করছ কেন ?—ক্লাবে তোমাদের সবই বড় ঘরের ছেলে—না ?

রাগে আর মনোজ কোন কথা বলিতে পারিল না,—তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া উঠিয়া গেল।

তাহার পরের দিন সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত মনোজের মনের গুমোট ভাব কিছুতেই কাটিল

না। মনে মনে সে কতবার সঙ্কল্প করিল, ক্লাবে সে নাম কাটাইয়া দিবে, সে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইবে শুভা তাহার নিকট হইতে কি চায়? কিন্তু সন্ধ্যায় যখন শুভা গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে রান্নাঘরে রাঁধিতে লাগিল — বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে হঠাৎ মনোজের মনের মেঘ একেবারে কাটিয়া গেল : ক্লাবে আজ সাজাহানের রিহার্সেল সুরু হইবে, তাহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

মনোজ ধীরে ধীরে উঠিয়া হাফ্‌শার্টটা গায়ে দিয়া রান্নাঘরে শুভার সামনে গিয়া বলিল, তুমি রাঁধতে রাঁধতে—শাঁ করে আমি একবার ঘুরে আসি,—কেমন? একটু না বেরুলে —মানে—দিন রাত বসে থাকলে রাতে ভালো ঘুম হ'তে চায় না।

শুভা মাথা হেলাইয়া সম্মতি দিয়া অদ্ভুত হাসি হাসিয়া গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল,

তোমারে বিদায় দিতে কেন এ বে-এ-এ-দনা মম

একেলা নিঝুম রাতে-এ-এ-এ্‌ কেমনে—

মনোজও হাসিয়া উঠিল— বাব্‌ বা, সব তাতেই তোমার গান!

রাত্রে একটু দেরী করিয়া ফিরিয়াও মনোজ শুভার চোখে মুখে কোন ভাবান্তর দেখিল না।

ঘুমের আগে শুভাকে একটু খুশী করিতে তাহার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে মনোজ বলে, তোমার দিদি ত আর আসে না?

কোন দিদি?

সেই মৃণাল-দি গো, ওই যে ঘোমটা ফেলে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

তার সঙ্গে মিশতে যে মানা করে দিলে!

মিশো তুমি, সঙ্গী সাথী কাজ টাজ হাতে না থাকলে চলবে কেন?

তার সঙ্গে মিশলে ভয় পাবে না ত তুমি? তুমি যে বলো বিপ্লবী দলের মেয়ে ও!

একটুখানি কি ভাবিয়া মনোজ বলিল, ভাব করতে চায়, মিশো তুমি,— মিশলেই যে দলে গিয়ে ভিড়তে হ'বে তার কি মানে আছে।

শুভার ঠোঁটের উপর হাসির যে ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল, রাত্রির অন্ধকারে মনোজের তাহা চোখে পড়িল না।

কয়েকদিন পরেই দেখা গেল সেই মৃণাল-দি আসিতে সুরু করিয়াছে। কি করিয়া যে সে খবর পাইল, আশ্চর্য! যাক্‌ অত আর ভাবিতে পারা যায় না : ক্লাবে এখন সাজাহানের রিহার্সেল চলিতেছে।

মৃণালদি যে কখন আসে বুঝিবার উপায় নাই। কোন কোন দিন সকালে আসিয়া

একবার ঢু মারিয়া যায়। আফিস হইতে বৈকালে ফিরিয়া মনোজ কোন কোন দিন শুভার মুখে শোনে, মৃণাল-দি এই গেল, অনেক বাড়ী বেড়িয়েছি আজ!

সন্ধ্যায় বাড়ী আসিয়া মৃণাল-দিকে দেখিলে মনোজ তখনই চা খাইয়া পলায়: যা'ক এখন আর শুভার কিছু বলিবার উপায় নেই, সে অনেকক্ষণ ক্লাবে থাকিতে পারিবে।

পাড়ায় কিন্তু অনেক কানাঘুষা চলে: দিনে দিনে হ'ল কি, ঘরের বউ!

সামন্ত বাড়ীর তেতালার ছাদ হইতে আশে পাশের অনেক কিছু দেখা যায়। সামন্ত বুড়োকে পাড়ার লোকে সবাই প্রায় ঠাকুরদা বলিয়া ডাকে। ঠাকুরদার ঘর তেতালায়। বুড়ো মানুষ উঠিতে কষ্ট হয়, তবুও।

রবিবারের সকালে মনোজ গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া সিগারেট ফুকিতেছিল, এমন সময় লেকে প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিলেন ঠাকুরদা।

কি হে ভায়া খবর কি?

এই ঠাকুরদা,—কেটে যাচ্ছে।

বউকে একেবারে স্বাধীনতা দিয়ে দিলে না কি?—ঠাকুরদা একটু হাসিলেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতারই যুগ, ঠাকুরদা!

ঠাকুরদা এইবার একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, না হে, একটু রশি টেনো।

মনোজ হাসিল: গিয়ে আপনার চিত্ত চঞ্চল করে তোলে বুঝি?...আচ্ছা মানা করে দেব আপনার বাড়ী যেতে!

না হে ঠাট্টা নয়। আমার বাড়ীর জন্য বলছি না আমি। আমার বাড়ী সে দিনে দশবার আসুক। ভদ্রলোকের বাড়ী ভদ্রলোকের মেয়ে আসবে না ত কি!... কিন্তু বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়াবে কেন? দিন দুপুরে—চোখে ঘুম নেই, ঘোমটাখোলা আর একটা মেয়েকে নিয়ে পাড়ার ছোট-লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়।—কোথায় তুলসীর মার বাড়ী, কোথায় বামী ঝির বাড়ী, ঐ যে সীতানাথ দোকান করে তাদের বাড়ী। প্রসন্ন রাজ মিস্ত্রীর বাড়ী, কার বাড়ী নয় বলো?—আমার ঐ তেতালার ঘর থেকে সব দেখতে পাই আমি!

শেষের দিকে ঠাকুরদা রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুনিয়া মনোজ স্তব্ধ হইয়া রহিল, রাগও একটু হইল: ঠাকুরদারই বা এত মাথা ব্যথা কেন? বিদেশী সে, কলিকাতায় চাকুরী করিতে আসিয়াছে মাত্র, বউ তাহার যাহাই করিয়া বেড়াক না কেন,—তাহাতে ইহাদের কি?—ঠাকুরদা—কিসের ঠাকুরদা? পাড়ার একটা মৌখিক সম্বন্ধ বই ত নয়।

বাড়ী আসিয়া—মনোজের একবার মনে হইল শুভাকে একটু সাবধান করিয়া দেয়, কিন্তু ক্লাবে তখনও সাজাহানের রিহার্সেল চলিতেছে। সুতরাং—

শুভার পল্লীভ্রমণ সমভাবেই চলিতে লাগিল।

দিন যায়।

সহরে নূতন আইনে দোকান-পাট বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মনোজ অতশত জানিত না; একখানা শেভিং স্টিক্ কিনিতে গিয়া শোনে, আজ দোকান বন্ধ। ব্যাপারটা বাড়ী আসিয়াই অবশ্য শুভাকে বলিয়াছিল—কিন্তু শুভা তখন মৃণালদির সঙ্গে বসিয়া গল্পে মত্ত—কথাটায় তেমন কর্ণপাত করে নাই।

কয়েকদিন পর শুভার বাপের বাড়ী হইতে চিঠি আসিল। চিঠি লিখিয়াছেন শুভার জেঠাই মা। অন্যান্য সংবাদের পর লিখিয়াছেন,…তোমার জেঠা মহাশয়ের বাঁচিবার আশাই ছিল না, কোনরূপে এবার রক্ষা পাইয়াছেন। দীর্ঘকাল তাহাকে অতি সাবধানে রাখিতে হইবে। তোমার দত্তবাড়ীর মতি কাকা আগামী রবিবার রাত্রি দশটার ট্রেনে বাড়ী রওনা হইবেন। ৬নং সনাতন শীল লেনে তিনি আছেন। তোমার জেঠামহাশয়ের জন্য ৫ সের পুরানো দাদখানি চাউল, আর আমার জন্য আধ পোয়া চোয়া তাহার নিকট অবশ্য অবশ্য পাঠাইবে।

রবিবারে সকালে মনোজ একবার করিয়া ক্লাবে ঘুরিয়া আসে। বিশেষ করিয়া —সাজাহানের মহলা চলিতেছিল, সুতরাং ঠিক সাড়ে বারোটায় মনোজ বাড়ী ফিরিল। মনে একটু ভয় ভয় ছিল—কিন্তু শুভা একটুও রাগ করিল না। স্নানাহার সারিয়া মনোজ যখন বিছানায় কাৎ হইতে সিগারেট টানিতেছিল—শুভা তখন আসিয়া মনোজের হাতে চিঠিখানা দিয়া বলিল, আজ আর তোমার ক্লাবে যাওয়া হবে না,…পড়ে ছাখো, একটু গড়িয়ে নিয়ে একবার বাজারে বেরোও, তারপর ওগুলি কিনে কেটে সন্ধ্যাবেলা বউবাজারে গিয়ে মতি কাকার কাছে পোঁছে দিয়ে এসো—কেমন?

মনোজ তখন মনে মনে সাজাহানের পার্ট আওড়াইতেছিল,—বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই বলিল, আচ্ছা।

ঘুম ভাঙিল সেই চারটায়। সকাল সকাল চা খাইয়া মনোজ বাহির হইল: ওসব নিয়ে আর বাড়ী আস্‌ছি নে,—একেবারে ঐ পথেই বউবাজারে যাবো। শুভা হাসিল: সকাল সকাল ফিরে একবার ক্লাবে গিয়ে বসবার ইচ্ছা আছে বুঝি! মনোজও হাসিল।

হাসি মুখে বাড়ীর বাহির হইয়া আধঘণ্টা পরে মনোজ গম্ভীর মুখে ফিরিয়া আসিল।

কি এরই মাঝে ফিরে এলে যে বড় ?

দোকান পাট সব বন্ধ।

মানে ?

মানে আবার কি—বন্ধ মানে বন্ধ,—রবিবার ওরা বারোটার পরেই দোকান পাট সব বন্ধ করে দেয়, জানতাম আমি, তবে আমার খেয়াল ছিল না।

শুভা বলিল,—কারণ ?

কিসের কারণ, আমার খেয়ালের,—না বন্ধের ?

ওরা দোকান বন্ধ করলো কেন ?

বন্ধের কারণ বিশ্রাম,—প্রতিদিন খাটবে,—বিশ্রাম করবে না ?

ওঃ—

কোমর ঘুরাইয়া পিছন দিয়া শুভা রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল, আর কথা বলিল না।

মনোজ কিছুক্ষণ বসিয়া শুভার কথা বলিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া ধীরে ধীরে ক্লাবের দিকে রওনা হইল।

দুই তিন দিন পরেই দুজনার মনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। শুভা হয়ত কথাটা ভুলিয়াই যাইত—কিন্তু একমাস যাইতে না যাইতেই মনের ক্ষত স্থানে আবার নূতন করিয়া আঘাত লাগিল। শুভার বাপের বাড়ী হইতে আবার লোক আসিয়াছে,—শুভাদের এক প্রজা—নাম—কুড়াণ। শুক্রবার সন্ধ্যায় আসিয়া কুড়াণ দেখা করিয়া গিয়াছে—

দিদিমণি, পরশু দুপুরে বাড়ী যাচ্ছি কিন্তু,—কালই দাদাবাবুর বইগুলি আনিয়ে রেখো—বলিয়া কুড়াণ শুভার ছোট ভাইয়ের লেখা বইয়ের এক ফিরিস্তি বাহির করিল। রবিবার সকালে আসিয়া সে বইগুলি লইয়া যাইবে।

শনিবারে আফিসে যাইবার সময়—শুভা স্বামীকে বইয়ের লিস্ট দিয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল, ভুলে যেও না কিন্তু, কাল আবার বইয়ের দোকান বন্ধ। এবার জিনিস না পাঠালে ওরা আমার মুখ দেখবে না।

পাগল,—বার বার !

কিন্তু অত খবর কে রাখে ! সন্ধ্যাকালে মনোজ মুখ ভার করিয়া বাড়ী আসিল।

স্বামীকে শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া শুভা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—বই ?

ধপ্ করিয়া ডেক্‌চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মনোজ বলিল, আমাকে মাপ করো শুভা,—লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে,...গিয়ে দেখি বইয়ের দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে।

মানে ?

মানে—ওদের নিয়ম হয়ে গেছে,—শনিবার চারটের আগেই ওদের দোকান বন্ধ করতে হ'বে।

কে এ নিয়ম করে ?

দোকানের কর্ম্মচারীরা। ওরা সমিতি করে ঠিক করেছে,—রবিবার ছাড়াও শনিবারে অর্দ্ধেক ওদের ছুটী দিতে হ'বে।

ট্রেনে এলে—না ট্রামে ?

কেন ?···ট্রেনে।

রেল কোম্পানীর কর্ম্মচারী সমিতি করে না এমন, কি করে বাড়ী আসতে দেখতাম।

তা' বলে আমার পর রাগছ কেন তুমি ?

তোমার' পর রাগব কেন, এরপর সূর্য্যদেব বিশ্রাম করবেন, চন্দ্রদেব—

মনের বেগ কতদিন থাকিত কে জানে, কিন্তু মনোজ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মান-ভঞ্জনের এক উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। কুড়াণ অবশ্য রবিবারেই চলিয়া গিয়াছে,—সপ্তাহের মাঝামাঝি একদিন বইগুলি কিনিয়া আনিয়া পরদিন শালার নামে পার্শেল করিল মনোজ। খরচ অবশ্য একটু বেশী পড়িল,—তবুও—

মনোজ হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

শুভার মাসতুতো বোনের বিয়ে—বৈশাখের শেষাশেষি। মেসোমহাশয় বাগবাজারে থাকেন। মাসীমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি নিজে আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। শুক্রবারে বিবাহ—মাসীমার অনুরোধ—শুভা যেন অন্ততঃ বৃহস্পতিবারে যায়।

ব্যাপারবাড়ী, মা,—লোকজন কিন্তু আমার বেশী নেই,—মনোজই যেন তোকে রেখে আসে। বৃহস্পতিবারে সকালেই যেন—

সকালে আর হয়ে উঠবে না, মাসীমা, ওঁর আফিস আছে,—সন্ধ্যাকালে।

চেষ্টা করিস,—নইলে আর কি করা যায়।

বৃহস্পতিবারে আফিসে যাইবার সময় শুভা স্বামীর হাতের মাঝে একখানা দশটাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—ভালো দেখে এনো কিন্তু—

ভালো দেখে—কি ?

ন্যাকা,—বোঝেন না কিছু, আনবে একখানা সাড়ী,—নন্তুর বিয়ে যে কা'ল !

ওঃ—মনোজের এইবার মনে পড়িয়াছে।

ঢাকাই বোধ হয় এ টাকায় তেমন ভালো হবে না,—না হয় একখানা মান্দ্রাজীই এনো।

আচ্ছা।

মনোজ বলিল বটে আচ্ছা,—আর নম্বর কেমন কাপড় আসে তাহা দেখিবার জন্য শুভা সারাদিন ছটফট করিতে লাগিল,—কিন্তু সন্ধ্যাকালে শুধুহাতে মনোজ ফিরিয়া আসিল।

কাপড় ?

মনোজের মুখ আঁধার, সে প্রথমে কোন কথা কহিল না,—কাপড়ের দোকান বন্ধ—একথা তাহার মুখে বাহির হইতে চায় না। দোকান বন্ধ, দোকান বন্ধ—এ কথা আর কতদিন বলা যায়,—আর সত্য হইলেও কতদিনই বা লোকে বিশ্বাস করে! দোকানীরা দোকান বন্ধ করে—এ যেন মনোজেরই অপরাধ!

যাবার সময় এত করে বলে দিলাম, তবু ভুলে গেলে!

ভুলে যাই নি, শুভা,—দোকান বন্ধ।

শুভা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল : আমাকে কি পেয়েছ তুমি ?

মনোজ অপরাধীর মত আগাইয়া আসিয়া শুভার হাত ধরিয়া বলিল, আমি সত্যি করে বলছি, দোকান বন্ধ আজ,—কাল খুব ভোরে উঠে গিয়ে তোমার কাপড় এনে দেবো।

শুভা বিশ্বাস করিল কি না,—ক্ষমা করিল কি না কে জানে,—হাসিয়া বলিল, বেশ।

সেদিন রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর আলাপ আর তেমন জমিল না।

পরদিন ভোরে চা খাইয়াই মনোজ কাপড় কিনিতে ভবানীপুর রওনা হইল। কিন্তু এ কি—দোকান যে বন্ধ,—দরজায় আটা কাগজে লেখা রহিয়াছে, এই দোকান বৃহস্পতিবার পূরা ও শুক্রবার বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। উন্মত্তের মত মনোজ আরও কয়েকটা দোকানের সামনে দৌড়াদৌড়ি করিল। সব দোকানই বন্ধ।

কম্পিতবক্ষে ঘামিতে ঘামিতে মনোজ বাড়ী ফিরিল—

বড়ই মুস্কিলে পড়লাম ত'—দোকান আজও বন্ধ তিনটে পর্য্যন্ত।

উত্তরে শুভা একটুও হাঁ হুঁ করিল না,—শুনিল কি না তাহাও বোঝা গেল না।

আফিসে যাইবার সময় নিতান্ত কাতর ভাবে অপরাধীর মত মনোজ বলিল, আফিস থেকে একটু সকাল সকাল ছুটী নিয়ে আমি কাপড় কিনে পাঁচটার মাঝেই ফিরে আসছি।

শুভা একটীও কথা কহিল না।

দুপুরে শুভার মাসতুতো ভাই মাণিক আসিয়া শুভাকে লইয়া গেল। শুভা একখানা চিরকুটে মনোজের কাছে লিখিয়া গেল—তুমি এ বিয়েতে যেতে পাবে না,—কাপড় নিয়ে সন্ধ্যাকালে তুমি যদি সেখানে যাও,—তবে আজ রাত্রেই আমি আত্মহত্যা করব। কথার আমার নড়চড় হয় কি না—সে কথা তুমি জানো।—

চিঠিখানা মনোজের বিছানার উপর রাখিল। ঘরের একটা ডুপ্লিকেট চাবি মনোজের কাছে আছে।

মনোজ ভয়ে ভয়ে বিবাহ-বাড়ী আর যায় নাই।

চার পাঁচ দিন পর শুভা ফিরিয়া আসিল। মনোজ আশঙ্কা করিয়াছিল কত কি তাল বাধিবে,—কিন্তু শুভা একটুও উচ্চবাচ্য করিল না। মুখখানা বেশ হাসিখুশী—যেন কিছুই হয় নাই। কথাবার্ত্তায় একটুও অভিমানের লেশ নাই।

তিন চার দিন পরে—এক সোমবারে সন্ধ্যায় শুভা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, ক্লাবে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ, কেন বল দেখি।

ক্লাবে যাবার আগে আমায় একসের ছাতু আর খানিকটা আকের গুড় এনে দাও।

মনোজ একবার ভাবিল—জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহস পাইল না,—গৃহিণীর নির্দ্দেশ মত জিনিস আনিয়া দিল।

পরদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া শুভা আবার আসিয়া বিছানায় শুইল!

কি, শুলে যে তুমি,—চা করবে না ?

উত্তর হইল, আমি এখন শুয়ে থাকব।

আরও কত সময় কাটিয়া গেল,—উনানে আঁচ পড়িল না। মনোজ এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া—আমতা আমতা করিয়া বলিল, উনানে আঁচ দিলে না ?

আজ আর রাঁধব না,—ছাতু খেয়ে আজ আফিসে যাও।

ব্যাপারটা মনোজ ভাল বুঝিল না—

অসুখ করে নি ত ?

না।

বেশি কথা বলিতেও মনোজ সাহস পায় না—কি জানি পাছে আবার যদি বাঁকিয়া বসে।

বিকালে—আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনোজ দেখে ঘরের দরজা বন্ধ। ডুপ্লিকেট লাগাইয়া ঘর খুলিয়া দেখে ঘরে ঝাঁট পড়ে নাই,—বিছানা এলোমেলো। ব্যাপার কি!

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া মনোজ দোকানে গিয়া চা খাইয়া আসিল, কিছু খাবারও খাইল,—ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছে—ওবেলা আফিসে সে ছাতু খাইয়া গিয়াছে।

লেকে একপাক ঘুরিয়া ক্লাবে একটু বসিয়া রাত্রি সাড়ে আটটায় মনোজ বাড়ী

ফিরিল। ঘরে কুলুপ বন্ধ, কিন্তু বারান্দার অন্ধকারে তিন চারজন লোক বসিয়া আছে। মনোজ আসিতেই—একজন জিজ্ঞাসা করিল,—কে, বাবু নাকি?

হাঁ,—কি চাই?

দুইজন প্রায় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মশাই, আপনার পরিবারের জন্য কি আমরা ঘর দোর ছাড়বো না কি?

তখনই আর একজন বলিয়া উঠিল, আমরা কি না খেয়ে মারা যাবো?

কেন—কি হয়েছে?

উনিই ত যুক্তি দিয়ে সব রাঁধাবাড়া বন্ধ করেছেন—বাড়ী এসে দেখি—শালি না রেঁধে শুয়ে রয়েছে। ও বেলাও ত রাঁধে নি,—ও বেলা মশায় মুড়ি খেয়ে কাজে গিয়েছি।

প্রথম দুইজনের একজন বলিল, আমার পরিবার, মশায়—আজ গরুর দুধ পর্য্যন্ত নিয়ে বেরুলে না,—রাঁধা বাড়া ত দূরের কথা—শালি বলে কি না—আমাদের সমিতি হয়েছে —আমরা আজ কাজ করবো না।

রাগে মনোজের গা কাঁপিতে লাগিল।

লোকের সাড়া পাইয়া তেতালার জানালা হইতে সামন্ত বাড়ীর ঠাকুরদা হাঁকিলেন, মনোজ-ভায়া বাড়ী এসেছ না কি হে।

হাঁ,—বলুন।

ওহে—বউ মা যে আজ উঠেও বসতে চায় না হে,—তোমার ঠাকু'মা যে আজ মারা গেল,—বলি না'ত বউ বাড়ী আছে না কি? কি করি বলো ত!

রাগে মনোজের নিজের গা নিজে কামড়াইয়া ছিঁড়িতে ইচ্ছা করিতেছিল। ঠিক এমনি সময় সাইকেল-হাতে মৃণালদির সঙ্গে শুভা বাড়ী আসিল।

সীতানাথ দোকানী সঙ্গে সঙ্গেই আসিল।

বাবু বাড়ী আছেন?—মনোজ বাবু?

কে?

এই যে এসেছেন—বলি মশায়, এ সব কি আরম্ভ করলেন, বলুন দেখি!

কি আরম্ভ করেছি আমি?

বলি, সারাদিন খেটে পিটে এসে ঘরে ভাত পাব না—অ্যাঁ?

তা আমি কি করব?

শুভা এবার আগাইয়া—আসিল: কি হয়েছে আমায় বলো।

আপনিই ত ঠাকুরুণ যত নষ্টের গোড়া।

কেন কি হয়েছে তোমার ?

বউ আমার আজ ভাত রাঁধে নি কেন ?—

বউ রোজ রোজ ভাত রাঁধবে কেন ?—একদিন তার ছুটি মিলবে না ?

ছুটি—কিসের ছুটি ?

মৃণাল-দি সাইকেল রাখিয়া আগাইয়া আসিল, তুমি তোমার দোকান কি কি বারে বন্দ দাও ?

কেন—বৃহস্পতি, আর রবিবারের অর্দ্ধেক।

ওদিন যদি লোকের কোন কিছুর দরকার হয়, কি করবে তারা ?

কেন—তারা হিসাব করে আগের দিন কিনে রাখবে ?

তা তোমরাও আমাদের ছুটির দিন হিসাব করে—আগের দিন বেশী করে খেয়ে রেখো—আর না হয় মুড়ি ছাতু খেয়ে থাকো।

কেন মুড়ি ছাতু খাবো—ভাত না রাঁধলে - আমার মাগের মাথা ছাতু করে ফেলবো না!

ছাখো না—একবার করে। নিজেদের ছুটি চাই- মেয়েমানুষের বেলায় নয় কেন! মেয়ে মানুষ—মানুষ নয়!

যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে পর পর দু'জন বলিয়া উঠিল, আমাদের পর রাগ করছেন কেন—সমিতি থেকে ঠিক করে দেছে—আমরা কি করব ?

শুভা বলে,—আমরাও সমিতি করেছি,—দেড়দিন রাঁধবো না আমরা—কোন কাজ করবো না।

আমাদের ওটা যে গবরমেণ্ট আইন করে দেছে, মা ঠাকরুণ!

মৃণাল দি বলে,—আমরাও আইন করিয়ে নিচ্ছি, এজিটেশন চালাচ্ছি ছাখো না!

সমাগত লোকগুলি মৃণালদির শেষের ইংরাজী কথাটী আর বুঝিতে পারিল না।

প্রশ্ন

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আনার নাহিক ঘুম নিশিভোর জেগে রই।
কেন আমি তাই ভাবি মনে
তুমিও রয়েছ জাগি' ঘুম নাই চোখে তব,
প্রেমাকুলা আমারি স্মরণে!

এ পারে দাঁড়ায়ে আমি ওপারে দাঁড়ায়ে তুমি
মাঝখানে বিরহের নদী,
সেতু-বন্ধ দুজনায় নিজ নিজ কূল হ'তে
গাঁথিয়া চলেছি নিরবধি।

সমুৎসুক দুটি বাহু উভ কূলে নভ ভেদি'
করবন্ধে যুক্ত হ'তে চায়,
মিলন-খিলানটিরে শূন্যে রচিবার আসে
সেই শূন্যে দুহাত বাড়ায়।

মণিবন্ধ করাঙ্গুলি আকুলি বিকুলি কত
মুদ্রা রচে নিশীথ তিমিরে
মাঝখানে ব্যবধান র'য়ে যায় মহাশূন্যে
দুজনা দাঁড়ায়ে দুই তীরে।

এই ত বিশ্বের রীতি জড়াইতে প্রাণে প্রাণে
অনুত্তীর্য নিত্য ব্যবধান,
ভুজবন্ধে থাক্ প্রিয়া দূরাৎ সুদূরে কিম্বা,
অস্পর্শনে দুই ত সমান।

তিলমাত্র ফাঁক থাক কিম্বা শতলক্ষ ক্রোশ
অতৃপ্তিতে তারতম্য নাই,
বিচ্ছেদ ছেদেই রয় দুই কভু এক নয়
পার্থক্য রয়েছে সর্ব ঠাঁই।

কল্পনা নিঃশব্দে আসি ফাঁকটুকু দেয় ভরি
পাই বা না পাই তবু চাই
ইচ্ছার আরোপ করি তোমার অজ্ঞাত চিত্তে,
চাও মোরে ভেবে সুখ পাই।

শুধু এই ইচ্ছা দিয়া শূন্যে বাঁধি গাঁঠছড়া,
তোমার অঞ্চলপ্রান্ত তায়
গ্রন্থিবদ্ধ হ'ল কি না আজি এই অন্ধকারে
কে আছে যে বলিবে আমায়?

প্রাকৃতিক

(উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সরোজকুমার মজুমদার

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে পায়ের শব্দে অনাদি বাবু চশমা উচু করে চাইলেন : এরিই মধ্যি চ'লে এলি? আজকাল এ-লাইনের ট্র্যামগুলো খুব জোরে যাচ্ছে বটে! বোস এখানে, তোর সঙ্গে আমার ঢের ঢের কথা বলার আছে। বাঁ হাত দিয়ে সোফা দেখিয়ে অনাদিবাবু ব'ললেন।

শীলা ব'ললো—চট ক'রে শাড়ীটা বদলে আসি? দু'মিনিট।

—উহুঁ। সেটি হ'চ্ছে না, তুমি আজকাল আমাকে বড্ড ফাঁকি দিচ্ছো। ভেতরে গিয়ে তো বৌদিদিদের নিয়ে গোল হ'য়ে ব'সে প'ড়বে। বোসো, বোসো—। শীলা ব'সলো—কী দরকারী কথা শুনি? পাকা চুল বুঝি হঠাৎ বেড়ে গেছে?

অনাদি বাবু হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।—শোনো কথা মেয়ের—পাকা চুল ছাড়া আমার আর কোন কথা নেই নাকি? আজকাল ও-কাজের জন্য লোক পেয়ে গিয়েছি। শঙ্কর একেবারে ওস্তাদ হয়ে গেছে এ-লাইনে। তুমি এবার সচ্ছন্দে ধর্ম্মঘট ক'রতে পারো।

সোফায় ব'সে শীলা শরীরটা একটু দুলিয়ে নিয়ে ব'ললো,—না ধর্ম্মঘট ক'রবো কেন! এই আমি তুলছি তোমার চুল। ভারী ওস্তাদ হ'য়েছে শঙ্কর, না! আমার চেয়েও আলগা ভাবে তুলতে পারবে কি? আসুক—না, দেখি! শঙ্কর! শঙ্কর! শীলা চেঁচিয়ে ডাকতে আরম্ভ ক'রলো।

অনাদি বাবু স্নেহের সহিত ওর গালে ছোট আঘাত ক'রে ব'ললেন,- আর ডেকে পরীক্ষা ক'রতে হবে না। পাগলি মা আমার। আচ্ছা, অতোটুকু ভাইপো, ওর সাথেও হিংসে করবি তুই?

—ক'রবো না-তো কী? শীলা ছোট বালিকার মতো চোখ লাল ক'রে ব'ললো, ক'রবো না-তো কী? আমার চেয়ে ভালো ক'রে পাকা চুল তুলতে পারবে না ও কিছুতেই, তবু তুমি ব'লবে কেন? হুঁ!

—বাবারে! কী মেয়েরে তুই লিলি!

অনাদিবাবু ওর মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে ব'ললেন,—আচ্ছা তোর পাকা চুল তোলার কৃতিত্বের পুরস্কার আমি দিচ্ছি তোমার মাথার কাঁচা চুলে হাত বুলিয়ে।

ওঁর কোলে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে শীলা শুধু ঘাড় কাত্ ক'রলো। পরে স্নেহে বাবার কোমড় জড়িয়ে ধ'রলো বলিষ্ঠ দুই বাহু দিয়ে।

সাধারণতঃ ও গম্ভীর প্রকৃতির চিরদিনই। মুখরতার চাইতে মূকত্বই ও পছন্দ করে বেশী। শুধু বাবার কাছে আর দাদার ছেলে মেয়েদের কাছে ও সম্পুর্ণ বিভিন্ন রূপে করে খেলা—ওদের কাছে ও হয় প্রগলভা, চটুল. ও হাস্যময়ী।

অনাদি বাবু লিলির (শীলা অনাদি বাবুর কাছে লিলি) মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ললেন,—দেখা হ'লো সুষমার সঙ্গে?

শীলা মুখ না তুলেই ব'ললো,—হুঁ!

—এর, ওর নাম কী? ইয়ে—প্রকাশের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না? অনাদি বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

শীলা মাথা নাড়িয়ে জানালো।

—সব পাগলের দল হ'য়েছে আজ কালকার ছেলে—মেয়েরা। আমি যখন বেঞ্চে ছিলুম তখন একটা কেস্ ক'রেছিলুম তা'তে অবিকল এই তোদের প্রকাশের ঘটনা। ওর বোনের—সুষমার কী ব্যবস্থা হ'লো?

—থাকবে এখন হস্‌টেলেই, পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলে একটা কিছু স্থায়ী-ব্যবস্থা ক'রতেই হবে আর কী! শীলা সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে ব'ললো।

অনাদি বাবু ব'ললেন,—বিয়ে করুক না এখন! একটা বিয়ে ক'রে ফেলুক! নইলে চ'লবে কী করে?

উৎসাহের সঙ্গে শীলা ব'ললো,—তুমি দিয়ে দাও না বাবা! সুনীল বাবুর সঙ্গে ওর বিয়ে ঘটিয়ে দিতে পারো? চমৎকার হবে!

অনাদি বাবু ন'ড়ে ব'সলেন,—সুনীলের সঙ্গে? তা বেশতো! ভারী ভালো ছেলে সুনীল। ওরা পরস্পর রাজী আছে তো? তবে আর কী? আমি বাকীটুকুন ক'রে দিচ্ছি। আচ্ছা লিলি, অনাদিবাবু অল্পক্ষণ পরে প্রস্তাব ক'রলেন, সুষমা তো আমাদের এখানেও থাকতে পারে! তা-কী হয় না?

—কী-যে তুমি ব'লো বাবা, তার ঠিক নেই! সে-কেন থাকতে চাইবে? একে তো সম্বন্ধ নেই—না-হয় মেনে নিলাম বন্ধুত্বের জন্য ভালোবাসার জন্য এক রকম আত্মীয়তা হ'য়ে গেছে।

কিন্তু দাদারা এতগুলো পুরুষমানুষ রয়েচেন বাড়ীতে । তা'র থাকা কী সম্ভব? বলো তুমিই বলো।

—হুঁ, সে একটা কথা বটে! মেয়েটার জন্যে মনটা মাঝে মাঝে টন্ টন্ করে। লক্ষ্মী মেয়েটি তোমার এই সুষমা। আচ্ছা—দেখি আমি কী ক'রতে পারি। ও-কে তুই নিয়ে আসিস লিলি মাঝে মাঝে এ-বাড়ীতে, মনে একটু আনন্দ পাবে। তবু রক্ষে, লিলি, প্রকাশ একটা বিয়ে ক'রে ফেলেনি,—তা'হলে সে-বেচারীর কী শোচনীয় অবস্থা হ'তো ভেবে দেখো।

শীলা মনে মনে নিজের অজ্ঞাতেই হেসে ফেলে,—ভাগ্যিস প্রকাশ একটা বিয়ে করেনি! সত্যিই বিয়ে সে করেই নি।

অনাদিবাবু ব'ললেন,—বিয়ে ক'রলে বৌকে ফেলে অবিশ্যি কখনই যেতো না পালিয়ে। কিন্তু আজ কালের মধ্যে ও ফিরে আসবে দেখিস্। আমি জানতুমই যে ও এমনি-একটা কিছু ক'রবে। মাথায় ওর একটু ছিট ছিলো কিনা!

শীলা হঠাৎ উঠে প'ড়লো,—যাই বাবা, আমি ভেতরে।

অনাদিবাবু হাত ধ'রে ওকে বসিয়ে দিয়ে ব'ললেন,—দেখো, বাজে কথায় কেমন কতগুলো সময় নষ্ট হ'য়ে গেলো! আজকের কাগজটা প'ড়ে শোনাচ্ছি দেখ কী রকম সব আজ গুবি ব্যাপার আছে। মেঝেয় পাতা কার্পেটের ওপর থেকে খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলেন।

মেয়ের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—আমি তোকে সে দিন ব'ললুম্ না লিলি যে রুজভেল্টের চালটা কিছুতেই টিকবে না। গেছে একেবারে ফেঁসে!

ঘটনাটা শীলা মনে ক'রতে পারে না। তবে ওর স্মরণ হয় দিন-সাতেক আগে বাবা একদিন রুজভেল্ট-এর কী এক কার্য্যকলাপের ইঙ্গিত ক'রে ব'লেছিলেন যে রুজভেল্টের মতো চৌকোশ রাজনীতিজ্ঞ দুনিয়ায় নেই। শীলা একটু হেসে ব'ললে শুধু,—হুঁ! চশমার খাপের মতো দেখতে চামড়ার চুরুটের খুলে একটা চরুট বের ক'রে ধরিয়ে নিলেন নিখিলবাবু।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় থেমে গিয়ে খবরের কাগজ মেয়ের দিকে উঁচু ক'রে ধ'রে ব'ললেন,—এই ছাখ। সাধে আমি বলি ভেরিটির মতো বোলার আজ পর্য্যন্ত একটা জন্মালো না পৃথিবীতে? দশটা ওভারের মধ্যে সাতটাই মেডেন্? আর তিনটে স্ট্যাম্প আউট্? তবে একটা গল্প বলি শোন—যখন বেঞ্চে ছিলুম, তখন জাস্টিস্ কাঞ্জীলালের সঙ্গে একদিন ভারী তর্কহ'য়ে গেলো এই নিয়ে। আমি যতো বলি, ম'শায়, অস্ট্রেলিয়া—

—বাবা, বাবা তোমার কাপড় পুড়ে গেলে দেখ। ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে শীলা ব'ললো।

অনাদিবাবু চড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠ্লেন্। এঃ পুড়ে গেছে—নতুন কাপড়টা!

—খবরের কাগজ পেলে তো আর তোমার কোন দিকে খেয়াল থাকে না! আমার চোখে না প'ড়লে আজ কী কাণ্ড হ'তে পারতো বল তো! শীলার মুখ একটু শুক্‌নো হ'লো।

—হ্যাঁ কিচ্ছু হ'তো না। ভাবছিস্ আমি টের পেতাম না? খুব পেতাম! দাঁড়া এডিটোরিয়ালের একটা পোরশান প'ড়ে শোনাচ্ছি তোকে। লেবার-গভর্ণমেণ্ট তো খুব শুনিয়ে দিয়েছে দু'কথা! জানিই আমি—

—তুমি পড়ো বাবা! আমি এবারে ভেতরে যাই। শীলা উঠে দরজার দিকে চ'লতে লাগলো। শুনতে পেলো বাবার গলা,—খবরের কাগজ তোদের আজ কালকার ছেলে-মেয়েদের কাছে যমের মতো! দাশ সাহেব ঠিকই বলেন—

ততক্ষণে শীলা দরজার আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় খুকুর তীব্র আর্ত্তনাদ কানে এলো। মুখ নামিয়ে শীলা দেখলো শঙ্কর আসন পিঁড়ি হ'য়ে মাটিতে ব'সে খুকুকে কোলের মধ্যে জাপটে ধ'রে খুকুর মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে পিনের মতো কী একটা জিনিষ খুকুর বাঁ-হাতের মধ্যে ফুটিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রছে আর খুকু অসহায় ভাবে ওর কবলের থেকে মুক্ত হবার জন্যে হাত-পা নেড়ে তুমুল চেষ্টা ক'রছে—সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে কাঁদছে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এসে শীলা শঙ্করের হাত থেকে খুকুকে এক রকম ছিনিয়ে নিলো।—

ব'ললো,—কী করছিস ওকে নিয়ে? হাতে ওটা কী তোর দেখি?

ওর অসুখ ক'রেছে যে! ইনজিসেন দিচ্ছি। শঙ্কর হাত মেলে দেখালো—একটা সুতায় সূঁচ!

ঠাঁশ ক'রে শঙ্করের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে শীলা ব'ললো,—হাতে সূঁচ ফুটিয়ে তুমি ইনজেক্‌শান দিচ্ছো! মস্ত ডাক্তার হ'য়েচো, না? অসভ্য ছেলে কোথাকার।

শঙ্কর কেঁদে ফেললো—মাকে সেদিন ডাক্তার বাবু ইনজিসেন দিলোনা, না? শুধু শুধি আমাকে মারবে! দাঁড়াও দাদুকে আমি ব'লে দিচ্ছি। দাদু, ওদাদু।

(ক্রমশঃ)

মনুষ্যত্বের ক্রম বিকাশ

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ

এই দুনিয়ার বুকে আমরা যে মানুষকে সঞ্চরণ করতে দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই মানুষ চিরদিনই এমনিতর মানুষ ছিল না। ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ রূপ থেকে রূপান্তরে চলে এসেছে। মনুষ্যত্ববিকাশের নিয়ানডারথেল (Neanderthal) যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী যুগান্তর পর্য্যন্ত মানুষের আদিম রূপ বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটা শুধুই যে বাহিরের পরিবর্ত্তন, এমন নয়, অন্তরের দিকেও এর পরিবর্ত্তন কম হয় নি। অথচ একথাও মিথ্যা নয় যে বাহিরের পরিবর্ত্তন যে গতিতে প্রসার লাভ করেছে, অন্তরের পরিবর্ত্তন সে গতিতে হয় নি।

মানুষ বাহির জগতকে নিজের আয়ত্তে আনবার জন্যে যে বিপুল সাধনা ও পরিশ্রম করেছে, তা'কে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই, কারণ সেখানে দেখেছি তার সুদূর প্রসারী সৃষ্টিকে। কিন্তু মনুষ্যমনের যে চিরন্তন ক্ষুধা তার জীবনকে প্রতিনিয়ত শাসন করেছে, সে ক্ষুধার সর্ব্বনেশে বৃত্তিকে আজও কি আত্তে আন্‌তে পেরেছে? পারেনি।—তা'র কারণ এ নয় যে মানুষ চেষ্টা করেনি! কত দর্শন, কত ধর্ম্ম তা'র প্রতিশেধক হিসারে সৃষ্টি হয়েছে—অথচ কোন ফল হয়নি। সমাজের উদ্ধত আদেশ চিরদিনই আস্ফালন করেছে—অথচ নরনারীর দেহ মনের ক্ষুধাকে শাসনে আন্‌তে পারেনি। এই অক্ষমতার কারণ এই যে, অন্তরের নিভৃত প্রদেশে যে ক্ষুধা আমরা অনুভব করি, সে ক্ষুধা স্বভাবধর্ম্মী। মনের ক্ষুধার নিষ্পেষণে যখন দেহের ক্ষুধার উন্মেষ হয়—অথবা দেহের ক্ষুধার নিষ্পেষণে যখন মনের ক্ষুধার উন্মেষ হয়, তখন এ দু'য়ের সংমিশ্রনে যে সমিল ক্ষুধার সৃষ্টি হ'লো তা স্বভাব-ধর্ম্মী এবং অনিবার্য্য। এর দু'টোই মানুষের প্রয়োজন। তাই এটা চিরকালই দেখা গেছে যে শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি—এ সবাকার উর্দ্ধে রয়েছে মানুষের ক্ষুধায় ভরা মন, দেহের অবচেতন কামনা—আর সবার উর্দ্ধে রয়েছে মনুষ্য পরম্পরা একটা চিরন্তন সমিল সুর। সে সুর নারী ও পুরুষের অন্তরে ও বাহিরে—সে সুর মিলনান্ত।

যদি নারী ও পুরুষের এই দেহমনের ক্ষুধা না থাকতো তবে শিক্ষা বলো, সভ্যতা বলো, ধর্ম্ম বলো, এ সবের কোন অর্থ থাক্‌তো কিনা, জানিনে। দেহের ক্ষুধাকে কাম বলি

আর যাই বলিনা কেন, সে ক্ষুধা বিশ্বময়! কেহ বলেন, দেহের ক্ষুধা নিষ্ক্রিয়, মনের ক্ষুধাই দেহের ক্ষুধাকে ক্ষেপিয়ে তোলে—আবার কেহ বলেন, দেহের ক্ষুধা সদাই জাগ্রত, শুধু মনের ইসারা পেলেই সেটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। দু'টোর কোনটা সত্যি, জানিনে, কিন্তু এ কথাই বা কেমন করে অবিশ্বাস করবো যে নারী পুরুষের এই দেহমনই ত আজ পৃথিবীর জীবন-ধারাকে রূপ দিচ্ছে নূতন থেকে নূতনতরের দিকে। মানুষের সঞ্চরণশীল মন ধেয়ে চলে সাগর বক্ষে উত্তাল তরঙ্গের দিকে, ধেয়ে চলে উত্তুঙ্গ হিমাচলের প্রস্তরীভূত তুষার শীর্ষে—কিন্তু সেই উন্মত্ত অ্যাড্‌ভেন্‌চারের অন্তরালেও দেখতে পাই শুধু দুটি মূর্ত্তিরই অশরীরি কায়া, নারী আর পুরুষ। সাহারার হিংস্র বালুকারাশির উপর দিয়ে উষ্ট্রপিঠে যে পুরুষ নামধারী মানুষটা বয়ে চলে, সে কি নির্জ্জন নির্ম্মম মরুভূমির উত্তপ্ত হাহাকারের মধ্যে একবারের জন্যও তা'র অন্তরের নারীকে ভুলতে পারে? পারেনা—তা'র স্বভাবধর্ম্মী কারণ আছে।

মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মানুষের দু'টো রূপ, দু'টো গতি ফুটে উঠেছে। একটা বহির্মুখী গতি, আরেকটা অন্তর্মুখী। বহির্মুখী গতির স্রোত সম্প্রসারণের দিকে, অন্তর্মুখী গতির ধর্ম্ম সঙ্কোচনের দিকে। সম্প্রসারণের মধ্যে পুরুষের বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে, চেষ্টা আছে। এর মধ্যে রোমাঞ্চ আছে, বিস্তারের সুখ আছে কিন্তু হৃদয়ের শান্তি নাই। অথচ অন্তর্মুখী গতির স্রোত সঙ্কোচনের দিকে, সে গতি আত্ম-কেন্দ্রিক। সে গতি নারীর, সে স্রোত বড় দুর্ব্বল, এতে বিস্তারের সুখ নেই, বিশ্বজয়ের সুখ নেই৷ কিন্তু হৃদয়ের অন্তহীন উন্মাদনার তুহীন শীতল শান্তির স্পর্শ আছে। দু'টী স্রোত বিপরীত ধর্ম্মী। অথচ দু'টোই মানুষের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য্য। পুরুষ চিরদিনই চেয়েছে বিস্তার, বিজয়—আর নারী চেয়েছে সঙ্কোচন, পরাজয়। তাই জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্ব বাধে নারী ও পুরুষে। এ দ্বন্দ্ব সুন্দর, এতে রোমান্স আছে, এতে আকর্ষণ আছে একেই বলি প্রেম।

যে পথিক বর্ষ বর্ষ ধরে শুধু দিক দিগন্তে পাগল হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, সে তার পথ-চলার ভেতর দিয়ে বিশ্বের সৌন্দর্য্যসুখ অনুভব করে, কিন্তু পথচলার যে অন্তহীন একঘেয়েমী তা'তে শান্তি নেই—তাই দেহ তার হেটে চলে সামনের দিকে, কিন্তু মন চলে ঘরের দিকে নারীর দিকে, সঙ্কোচনের দিকে। ঘরে সুখ হয়ত দীপ্তিহীন, আশা হয়ত ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু সেখানে আছে শান্তি শান্তির স্পর্শে আছে সুখের বাড়া অনেক সুখ। সে শান্তিতে ব্যাপ্তি নেই, গতি নেই, সম্প্রসারণ নেই, আছে গুপ্তি, আছে সুপ্তি, আছে স্থিতি, আছে সঙ্কোচন। গৃহ, সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র—এ সব আর কিছুই নয়, নরনারীর দ্বন্দ্বশঙ্কুল সঞ্চরণ শীল

মনেরই বহিঃপ্রকাশ। সম্প্রসারণের সুখ আর সঙ্কোচনের শান্তির জন্যেই এদের সৃষ্টি করা হয়েছে — এদের সৃষ্টি করেছে মানুষ।

গৃহে যে নারী শান্তিতে পায় সান্ত্বনা, সে নারী ছুটে যেতে চায় বাহির বিশ্বে উন্মুক্ত আকাশের নীচে সুখের আশায়, পুরুষের কাছে। তাই নারী চায় পুরুষকে নিয়ে নীড় বেঁধে সুখ ভোগ করতে। বাহির বিশ্বে পুরুষ সদাই মত্ত, চলার বিরামহীন দুর্গম পথে—সে চায় থামতে, চায় স্থিতি, চায় গৃহকে, ঘর ও বাইরের আকর্ষণ। এ আকর্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যৌন। যৌনবোধ নরনারীর জন্মের সঙ্গেই গ্রথিত। একে কেহ বলেন প্রেম, কেহ বলেন কাম। যাই বলিনা কেন, এ আকর্ষণ শাশ্বত, অনিবার্য্য।

নারী পুরুষের এই যৌন আকর্ষণ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। হাজার হাজার বছর আগে পুরুষ নারীকে ভালবেসেছে, নারী পুরুষকে ভালবেসেছে, আজও বাসে। যে যৌন আকর্ষণ চীরপরা বনমানুষকে ছেয়ে ফেলেছিল, তা আজ অট্টালিকা-বাসী সভ্য মানুষকেও পেয়ে বসেছে। কি দেবতা, কি মানুষ—যৌন আকর্ষণ সবার কাছেই সমানভাবে প্রখর। যৌনতায় ঐশ্বর্য্য নেই। যৌনতায় সর্ব্বসাধারণের সাম্যভাব আছে, আভিজাত্য নেই।

ভারতবর্ষেও এ প্রেমের ইতিহাস আছে। দেখেছি খনার প্রেম, দেখেছি সংযুক্তাকে, শুনেছি অনেক কালের প্রেমের ইতিহাস। দেখেছি পর্ব্বত দুহিতা প্রেমসিঞ্চিতা পার্ব্বতীকে—

'আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্, বাসো বসানা তরুণার্কবাগম্
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥'

দেখেছি পার্ব্বতীপ্রেমবিহ্বল আত্মভোলা শঙ্করকে। দেখেছি মন্মথপীড়িতা আশ্রম বালিকা শকুন্তলাকে, দেখেছি মৃগলোভী দুষ্মন্তরাজ্যের উচ্ছ্বসিত মিলনোচ্ছ্বাস—দেখেছি বিরহকাতরা তপস্বিনী শকুন্তলাকে—

'ক্ষামক্ষামকপোলমাননমূঢ় কাঠিন্য মুক্তস্তনম্'

দেখেছি প্রেমের ইতিহাস, দেবতায় আর মানবে, চিরকাল।

আমরা ভালবাসি, ভালবাসা বুঝি, অথচ কোন সীমারেখা দিয়ে তা'কে আমরা বিচার করিনে, বিচার করতে পারিনে। আসলে প্রেমের কোন definition নেই। কেহ বলেন 'Love is blind'—এ কথা মানি, কিন্তু বিচার করা প্রেমেরও অভাব দেখিনে। তবে একটা সত্য সর্ব্বজনগ্রাহ্য—প্রেমের ভিত্তি যৌনতায়। দেহ এবং মন নিয়েই প্রেমের কারবার, কার প্রাধান্য কত তার কোন ratio নেই। যাঁদের আমরা মনিষী বলি, তাঁরা প্রেমের অনেক ব্যাখ্যা করেছেন বটে, কিন্তু সেগুলো কেবলই স্থূল বিচার, তা'তে সন্দেহ নেই। সেগুলো

definition নয়, explanation. একথা ভুল্‌লে চলবেনা যে definitionএ আর explanationএ অনেক তফাৎ।

দার্শনিক হেগেল (Hegel) বলেছেন—"Lone is the Complete Surnender of the "ego" to anather "ego" or to an ideal. Not the sacrifice of the possession or wealth of the ego, but the "I" itseif must be given away" এখানে দেখ্‌ছি নিজেকে অপরের সত্তার মধ্যে আংশিক অথবা পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দেওয়ার মধ্যেই আছে প্রেমের বিচার। সত্তাহীনতার অন্তরালে ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে রাখ্‌তে হ'বে—তা নইলে তা'কে প্রেম বলা চলবেনা। Hegelএর মতে প্রেমে personality আছে। Impersonal প্রেম ইন্দ্রিগ্রাহ্য নয়, সম্ভবও নয়। নিজের অস্তিত্বকে ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। Hegelএর "ego"তে মন এবং দেহ দুটোই আছে। সুতরাং প্রেম এবং কাম দু'টোকেই "ego"র সঙ্গে আর একটা "ego"তে পরিণত করতে হ'বে। Freud প্রভৃতি সাইকো-এনালিস্টরা কিন্তু দেহকে তথা যৌনতা এবং কামকেই প্রেমের আদি কারণ বলে মেনে নিয়েছেন। অনেক সময় দেখ্‌তে পাওয়া যায় বটে যে, নরনারীর প্রেমের আনাচে কানাচে কামের কোন গন্ধ নেই.—কিন্তু সাইকো-এনালিস্টরা বলেন যে মানুষের সাধারণ মনের নীচে আরেকটা অসাধারণ এবং অনিবার্য্য অবচেতন মন আছে, যার আশুক্রিয়া প্রত্যক্ষ নয় বটে, কিন্তু তারই মধ্যে যৌনতার বীজ লুক্কায়িত আছে এবং দেহ ও মনকে পরোক্ষভাবে যৌনতার বহিঃপ্রকাশের দিকে ধাবিত করে। যৌনতা মুখ্য, প্রেম গৌণ। কোনটা সত্য জানিনে, তবে ইন্দ্রিয় আছে, এটা সর্ব্বৈব সত্য।

"ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত; এই জন্য তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বশ্যভাবের ন্যূনতা এবং তাঁহাদের ব্যবহারে নম্রতার ত্রুটি জন্মিয়া যাইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে গুণগুলি আছে, সে গুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয়না এবং তাঁহারা সুখ্যাতি ভাজন হইতে পারেন না।"

—ভূদেব

কলা—ভবন

দর্শক ও চিত্রকর

সকল দর্শকই অল্প বিস্তর ছবির সমালোচক, কেননা প্রত্যেকেই ছবি হইতে আনন্দ লাভ করিতে চান। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের রসোপলব্ধি সমান হয়না। যাঁহার অনুভূতি যত সূক্ষ্ম ও যত সজাগ তাঁহারই রসোপলব্ধি তত পরিপূর্ণ হয়, কেননা ছবি আঁকিবার সময় চিত্রকরের অন্তরে যে সকল ভাব উদয় হয় তিনি তাহার খানিকটা উপলব্ধি করিতে পারেন। এক কথায় ছবি হইতে প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে হইলে চিত্রকরের মনের সহিত দর্শকের মনের একটি সুমধুর মিলন আবশ্যক। এই মিলনই ছবির রসোপলব্ধির মূল কথা।

চিত্রকরের দুইটি কাজ ; এক, যে-জিনিষের ছবি আঁকিবেন সমগ্র অন্তর দিয়া তাহাকে অনুভব করা, এবং দুই, এই উপলব্ধিকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিবার প্রবল প্রচেষ্টা। অবশ্য এ দুইটি কাজই প্রায় সঙ্গে চলে। দ্বিতীয় কাজটির সহিত দর্শকের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহার সম্বন্ধ প্রথমটির সহিত। আমরা যে-মিলনের কথা বলিতেছি তাহা সার্থক হয় যখন

দর্শক চিত্রকরের উপলব্ধিকে নিজে গ্রহণ করিতে পারেন, তখনই চিত্রকরের সৌন্দর্য্যানুভূতি দর্শকের সৌন্দর্য্যানুভূতি স্পন্দিত করিয়া তোলে।

চিত্রকরের সকল ক্ষমতা পূর্ণতা লাভ করিলে তাঁহার ছবির ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং নিজের প্রতিটি আবেগ আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারেনা। তাঁহার এই ব্যক্তিত্ব ও আবেগপুঞ্জ দর্শকের কাছে পৌছান দরকার। লিওনার্দো এবং মিকেল এঞ্জেলোর ছবি পাশাপাশি ধরিলে বুঝা যায় এই দুইদল শিল্পী ছবির ভিতর দিয়া কি ভাবে নিজেদের উম্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের ছবি দেখিয়া ইঁহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ধরিতে বেগ পাইতে হয়না। ইঁহারা প্রায় সমসাময়িক, কোন কোন বিষয়ে দুইজনের ভিতরে মিল থাকা স্বাভাবিক। আমরা যদি বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন দেশের চিত্রকরের ছবি লইয়া আলোচনা করি তাহা হইলেও দেখিতে পাইব তাঁহাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের ছাপ তাঁহাদের ছবিতে বিদ্যমান। যে সকল চিত্রকরের ছবিতে এই স্বাতন্ত্র্যের ছাপ নজরে পড়েনা, বুঝিতে হইবে চিত্রকর হিসাবে তাঁহারা আপন আপন ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

চিত্রকর ও দর্শকের মধ্যে দর্শকেরই বেশি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, চিত্রকর তাঁহার উপলব্ধি হইতে অসীম আনন্দ লাভ করেন, বস্তুত তিনি এই উপলব্ধির মাঝে নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলেন। কাজেই তাঁহার কাছে এই উপলব্ধির সত্য বাস্তব সত্য হইতে অনেক বড় হইয়া উঠে। এ অবস্থায় তাঁহার কাছে পারিপার্শ্বিক জগৎ অস্বীকার করা কঠিন হইয়া পড়ে, বাস্তব সত্যের পরিবর্ত্তে চিত্রকরের সত্য গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হয়না। এইখানেই দর্শকের শিক্ষার আবশ্যক, কিন্তু রসোপলব্ধির পক্ষে তাঁহার শিক্ষা যতই ভাল হউক না কেন তবুও চিত্রকর যে-আনন্দ ও যে-আবেগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন দর্শক তাহার সবটুকু উপভোগ করিতে পারেননা, আর পারিলেও তাহা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়না। তাই দেখা যায় চিত্রকরের দিনগুলি যেমন একটানা আনন্দের ভিতর দিয়া কাটিয়া যায়, দর্শকের তাহা যায়না। দর্শকের পরিপূর্ণ আনন্দের দিনগুলি সীমাবদ্ধ। তিনি যেন চিত্রকরের সঙ্গে অতটা দূরে যাইতে পারেন না; তাঁহাকে এইটুকু লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়:

"Enough for me in dreams to see,
And touch thy garment's hem,
Thy feet have trod so near to God
I dare not follow them."

কিন্তু আর এক দিক দিয়া দর্শকের যে-সুবিধা আছে চিত্রকরের তাহা নাই। একখানি ছবি ভাল না লাগিলে দর্শক আর একখানি দেখিতে পারেন, বা গ্রীক যুগের ছবি

মালী CEZANNE অঙ্কিত

PAUL CEZANNE (১৮৩৯-১৯০৬) জন্মগ্রহণ করেন Aix in Provence-এ। যে Post impressionism আজ পৃথিবীজোড়া খ্যাতি বিস্তার ক'রেছে, Cezanneই তার স্রষ্টা, এবং এই জন্যেই দিকে দিকে দেশে দেশে তাঁর এত প্রসিদ্ধি, এত সমাদর। ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী কোনো কিছু সৃষ্টি ক'রে তিনি সাময়িক আনন্দলাভ করতে চান্‌নি, তিনি চেয়েছিলেন চিরস্থায়ী ও চিরজীবী সৃষ্টি দিয়ে শিল্পজগতকে সমৃদ্ধ করতে।

তিনি ব'লেছেন—"I wish to mske of Impressionism something solid and durable, like the art of the Old Masters:." এই ছিলো তাঁর লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্য তিনি ভেদ করতে পেরে কেবলমাত্র নিজেই কৃতার্থ নন্, শিল্পজগতও তাঁর কাছে ঋণী।

দেবদূতের ভবিষ্যদ্বাণী BLAKE অঙ্কিত

WILLIAM BLAKE (১৭৫৭-১৮২৭) লণ্ডন নগরে এক ব্যবসায়ীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এঁর শৈশবেই। যখন এঁর বয়স মাত্র দশ বৎসর, তখনই ইনি ছোটো খাটো কবিতা রচনা আরম্ভ করেন; এবং সেই সঙ্গে ছবি খোদাইও করতে থাকেন।

শিল্পকলার দিক থেকে এঁর যে-খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে, এঁর কবি-খ্যাতিও তার তুলনায় অসামান্য নয়। এঁর কবি-খ্যাতি এঁর শিল্পী-খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়েছিলো। Dante Rossetti-কে আমরা একাধারে কবি ও শিল্পী বলে জানি। তার সঙ্গে এটুকুও জেনেছি-যে Blakeএর ভাগ্যও সেই দ্বিবিধ সম্মানে সমুজ্জ্বল। এমন সৌভাগ্য আর কোনো শিল্পী লাভ ক'রেছেন ব'লে পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

হইতে আনন্দ না পাইলে আর এক যুগের ছবি যাচাই করিতে পারেন। কিন্তু চিত্রকর নিজের দেশ কাল এবং সর্ব্বোপরি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীর মাঝে এমন ভাবে আবদ্ধ থাকেন যে কোন মতেই নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন না। নানা রকম মতবাদ ও নিজের আত্মাভিমানও তাঁহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। এসব দিক দিয়া দর্শক সম্পূর্ণ মুক্ত।

ছবি হইতে দর্শক ঠিক যে-জিনিষটি আশা করেন তাহা অনেক সময় পাননা। সাধারণত তিনি বাস্তব জগতের প্রতিলিপিই ছবিতে খুঁজিয়া থাকেন। কেননা, বাল্যকাল হইতে বাস্তব জগতের সহিত তাঁহার এমন একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যে তাঁহার পক্ষে অন্য কোন জগতের কল্পনা করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কাজেই কোন ছবি যদি তাঁহাকে বাস্তব জগতের কথা মনে না করাইয়া দেয় তাহা হইলে তাঁহার কাছে সে ছবির কোন আদর থাকেনা। ছবির পাহাড় পর্ব্বত গাছপালা দেখিয়া তাঁহার মনে যদি সত্য সত্য পাহাড় পর্ব্বত গাছপালার কথা না জাগে তাহা হইলে ছবির মূল্য কি? কিন্তু ইহার উত্তরে চিত্রকর বলেন, বাস্তব জগতের প্রতিলিপিই যদি চাই তাহা হইলে ছবি কেন, সেজন্য ফটো রহিয়াছে। চিত্রকরের কাজ বাস্তবের প্রতিলিপি আঁকা নয়, তাঁহার কাজ আরও বড়, আরও মহৎ। কিন্তু এর উত্তরে দর্শকের মনের সন্দেহ ঘুচিতে চায় না। তিনি মাথা নাড়িয়া বলেন,—"এটা কি ছবি? এমন গাছ তো বাপু আমি জীবনে দেখিনি, আর ঐ যে মানুষ, ও মানুষ না ভূত?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ তর্ক বহুদিনের, কিন্তু রসোপলব্ধির পথে যে সকল দর্শক খানিকটা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা এ তর্কের জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারিয়াছেন।

এখানে মনে রাখা দরকার সকল চিত্রকর আপনার ইচ্ছামত কাজ করেননা, কাহারও দৃষ্টি থাকে দর্শকের দিকে, দর্শক কি চান ছবিতে ঠিক সেইটিই ফুটাইয়া তোলা হয় তাঁহাদের কাজ। যেখানে চিত্রকর দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যগ্র সেখানে চিত্রকলার অবনতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। গ্রীক ভাস্কর্য্য অতি বাস্তব হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পতন সুরু হয়।

যে সকল আর্ট চোখে দেখিয়া উপলব্ধি করিতে হয় তাহাদের সৃষ্টির মূলে একটি বড় অসুবিধা থাকে, তাহা এই যে তাহাদের উপাদান একান্ত ভাবে বাস্তব। বাস্তব উপাদানে গঠিত হওয়ার ফলে তাহারা সহজে সঙ্গীত বা কবিতার মত সুদূর প্রসারী হইতে পারেনা। সঙ্গীত বা কবিতার সীমা কালে, কিন্তু চিত্রকলার সীমা বাস্তবে। তাই চিত্রকলা যখন এই বাস্তবের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ রসানুভূতির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয় তখন তাহা বুঝিতে সাধারণ দর্শকের পক্ষে অসুবিধা হয়। বাস্তব উপাদানে গঠিত দৃষ্টি দেখিতে বসিলে বাস্তবের কথাই আমাদের সকলের আগে মনে আসে, আর এই বাস্তবের বন্ধন হইতে আমরা সহজে

মুক্ত হইতে পারিনা। কিন্তু ছবির প্রকৃত রসোপলব্ধি করিতে হইলে এই বন্ধন ছিন্ন করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

বাস্তবের প্রতিলিপি না হইলেও এক শ্রেণীর ছবি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল লাগে। উদাহরণ স্বরূপ জাপানী ছবি উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানী ছবি এবং এক দিয়া প্রাচ্যের সকল দেশের ছবিই এমন যে একবার তাকাইলে চোখ ফেরান যায়না। এ ছবিগুলির প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় তাহাদের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম কাজ ও সমস্ত মিলিয়া একটি অপরূপ সজ্জা। হোকুসাই-এর একখানি ছবি সারা জীবন ভরিয়া দেখিলেও কখনও পুরাণ হইবেনা। এই জাতীয় শিল্পীর এক একখানি ছবি এক একটি প্যাটার্ণ। কাজেই এসব ছবি বুঝিতে বেগ পাইতে হয়না। কিন্তু যে ছবিতে বহু প্যাটার্ণের সংমিশ্রন হইয়াছে যত মুস্কিল হয় তাহাকে লইয়াই। এমন ছবিও আছে যাহাতে একটির পর একটি প্যাটার্ণ এমন ভাবে সাজান হয় যাহার ফলে গোটা ছবিখানি দর্শকের কাছে অর্থহীন রঙের খেলা বলিয়া বোধ হয়। এই রকম ছবি লইয়া তর্ক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সেজানের একখানি ছবি সাধারণ দর্শকের সামনে ধরিলেই বুঝা যায় সেজানের অসংখ্য প্যাটার্ণ সমন্বিত ছবিখানি তাঁহার কাছে কেমন অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর যখনই বাঁধাধরা পথ ছাড়িয়া নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করেন তখনই দর্শক মহলে অভিযোগ দেখা দেয়।

ভাল ছবির অনেকগুলি আকর্ষণের বিষয় থাকে, তাহাদের মধ্যে সৌকুমার্য্যই সর্ব্বপ্রথম এবং ইহাই সহজে অনুভব করা যায়। সৌকুমার্য্য বাস্তবতাকে ঢাকিয়া দেয়, কিন্তু ইহা একটি সূক্ষ্ম ভাবের উপর অবস্থান করে, একটু এদিক ওদিক হইলেই নষ্ট হইয়া যায়। বাস্তবতা মাত্রাধিক্য হইয়া পড়িলে সৌকুমার্য্য অনুভব করা যায়না। আবার, চিত্রকর যেখানে ছবিতে অতিরিক্ত মাত্রায় মাধুর্য্য ফুটাইতে চান সেখানেও ইহা নষ্ট হইয়া যায়, তখন ইহার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় মাত্রাতিরিক্ত মিষ্টতা। সৌকুমার্য্যের ভিতর যে একটি সাম্যতা ও পরিমেয়তা থাকে এই মিষ্টতার ভিতর তাহা থাকেনা। অনেক বড় বড় শিল্পী ছবিতে অতিরিক্ত মিষ্টতা ফুটাইতে যাইয়া নিজেদের সম্ভাবনা নষ্ট করিয়াছেন। এবং এই জন্যই ইংলণ্ডের উনবিংশ শতাব্দীর আর্ট অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ আর্টের কাছাকাছি আসিয়াও ঠিক সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ছবি দেখিবার সময় দর্শকের এ সকল বিষয় মনে রাখা দরকার।

নির্ম্মম ভাবে নিজের সমালোচনা নিজে না করিতে পারিলে সাধারণ দর্শকের পক্ষে চিত্রকলার প্রকৃত রসোপলব্ধি সম্ভব হয়না। একখানি ছবি ভাল লাগিল বা খারাপ লাগিল কেবল এইটুকু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলেনা। ভাল লাগা ও খারাপ লাগার কারণগুলি নানা ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। এদিকে দর্শক কাহারও সাহায্য পাইবেননা,

তাহা ধরিয়া লইতে হইবে। সৌন্দর্য্য উপভোগই ছবি দেখার একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু এ সৌন্দর্য্য বস্তু বিশেষের গুণ নয়, ইহার স্থান মনে। ছবির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের ছবি দেখা দরকার। তবেই চিত্রকরের মনের সহিত দর্শকের মনের যে-মিলনের কথা আমরা বলিয়াছি তাহা সম্ভব হইবে।

"বিশ্বে ছোটো বড়ো নানা পদার্থ আছে। থাকা-মাত্রের যে-দাম তা সকলের পক্ষেই সমান। নিছক অস্তিত্বের আদর্শে মাটির ঢেলার সঙ্গে পদ্মফুলের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদ নাই। কিন্তু মানুষের মনে এমন একটি মূল্যভেদের আদর্শ আছে, যাতে প্রয়োজনের বিচার নেই, যাতে আয়তনের বা পরিমাণের তৌল চলেনা। মানুষের মধ্যে বস্তুর অতীত একটি অহৈতুক পূর্ণতার অনুভূতি আছে, একটা অন্তরতম সার্থকতার বোধ। তাকেই সে বলে শ্রেষ্ঠতা।"

—রবীন্দ্রনাথ

চলচ্চিত্রকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের বাহন করার পশ্চাতে লেনিনের উক্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, তিনি বলেন "সকল কলার মধ্যে রুশিয়ার পক্ষে সব চেয়ে বেশী দরকারী, আমার মতে, চলচ্চিত্র"। ৯১৭ সালে শাসনভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই সোভিয়েটতন্ত্র এই নীতি অবলম্বন করে যে, সর্ব্বসাধারণের যত প্রকার ভাব-প্রকাশের উপায় আছে, সকলের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব বলবৎ হইবে। চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, সংবাদপত্র, সাহিত্য ইত্যাদি ভাব প্রকাশের সকল শাখাতেই এই নীতি প্রযুজ্য হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, সরকারী মতানুযায়ী শাসনতন্ত্রের নূতন ও পরিবর্ত্তিত ভাবধারা জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হইবে। কিন্তু, এ ভাব-ধারা পরিবেশনের জন্য কলা-স্থষ্টির দিক হইতে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই। নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে সমাজকে যেরূপে গড়িয়া লইতে হইবে, নূতন সমাজের যাহা উপযোগী, তাহাই ফুটাইয়া তোলা হইল নৃত্য, গীতের রস সম্ভারে। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার যে কৌশল রুশিয়ায় উদ্ভূত হয় তাহা রুশিয়া ব্যতীত অন্য দেশে হয়ত সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, রুশিয়ায় চলচ্চিত্রকে জাতীয়তার পর্য্যায়ে তুলিতে কিছু সময় লাগে। ১৯১৯ সালের পূর্ব্বে এ পর্য্যায়ে চলচ্চিত্র উঠিতে পারে নাই। চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ নীতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পিপলস্ কমিশারিয়েট্ অব্ এডুকেশনের (জাতীয় শিক্ষা পরিষদের) আওতায় একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করা হয়। এই কমিশনের অধিকাংশ অধিবেশন হয় লেনিনগ্রাডে। ইহার পরেই চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ ভার সরকারী দপ্তরের উপরে গিয়া পড়ে, আর তখন হইতে লেনিনের মতানুযায়ী চলচ্চিত্র গড়িয়া উঠিতে থাকে, এবং একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকে। বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতা ও দর্শকের উপযোগী করিয়া বিশেষ বিশেষ চিত্র সম্পাদিত ও রচিত হইতে থাকে এই সময় হইতে, আর চলচ্চিত্র প্রদর্শনে যে আয় হয় তাহা রাজকোষে একত্রিত হইয়া উন্নত হইতে উন্নততর চিত্র প্রস্তুত হইবার সহায়তা করে।

স্থষ্টি-কুশলতার দিক হইতে বিষয়টির উপর দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রুশিয় চিত্র-শিল্পীরা মানব মনের, ও মানব হৃদয়ের বাণী কি তাহাই দর্শক ও শ্রোতার সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিবার প্রয়াস করেন—অন্য দেশের শিল্পীদের প্রচেষ্টা হইতে পার্থক্য এই যে, রুশীয় শিল্পীরা কয়েকটি গল্প স্থষ্টি অথবা কয়েক প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন দেখাইয়া শ্রোতা ও দর্শকের চিত্ত-প্রসন্ন ও মনোরঞ্জন করিবার জন্য ব্যগ্র হন নাই।

অপর একটি দিকে সোভিয়েট চলচ্চিত্র-প্রযোজকেরা দৃষ্টি দিলেন; সেইটি হইল জন-মন-উদ্বোধন। জন-মন আর দর্শকের মনের মধ্যে তারতম্য আছে প্রচুর। অপর দেশে যে-কোন রঙ্গমঞ্চে যে সকল দর্শক ও শ্রোতা উপস্থিত হয়, তাহার ভিতর সমাজের সর্ব্বস্তরের

লোক-সমষ্টি থাকে না। সোভিয়েট-তন্ত্রে যাহা কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই যাহাতে সমাজের সকল লোকের মধ্যে সম-পরিমাণে ফলপ্রদ হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য থাকে। চলচ্চিত্রের দ্বারাও যাহাতে জনগণের মধ্যে এই সমতা রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে সোভিয়েট-তন্ত্রে মনোযোগ থাকে। চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যেও এমন একটি মতবাদ বা তত্ত্ব প্রচারিত হয় যাহা সর্ব্বসাধারণের তুল্য পরিমাণে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পক্ষে উপযোগী হয়। জাতীয় জীবনের, জাতীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টার, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যে চিত্রে প্রদর্শিত ও পরিস্ফুট না হয়, সে চিত্র রুশিয়ায় সোভিয়েট আমলে সুচিত্র বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নয়। এমন একটি গল্প বা কাহিনী রচিত হয়, যাহা জাতীয় সমতা বজায় রাখিতে সক্ষম। যে ঘটনাচক্র অবলম্বন করিয়া রুশিয়ায় নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রধানত তাহাই রুশ-চলচ্চিত্রে দৃশ্যাবলীতে পরিণত হইয়াছে। সেইজন্য স্বভাবতই জ্বারের রাজত্বকাল ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাহিনী, গল্প ও কথা সৃষ্টি করা হয়। জ্বারের প্রভুত্বকালে সোভিয়েটের সময়ে অনুষ্ঠিত নিয়মকানুনের, সুখ সুবিধার, তুলনা অতি প্রখর করিয়া তুলিবার পরিকল্পনা সোভিয়েট চলচ্চিত্রের বিশেষত্ব।

রুশিয়-চলচ্চিত্রের কথা প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট-চলচ্চিত্রের কথা ব্যতীত এখন আর অপর কিছুই নয়। সময়ান্তরে সোভিয়েট-চলচ্চিত্রের কথা আরও কিছু বলা যাইতে পারে।

আমার জীবন

শেখভ

গোপাল ভৌমিক

রবিবার দিন হঠাৎ অতর্কিতভাবে ডাক্তার ব্লাগোভো এসে হাজির। তাঁর পরিধানে শাদা গ্রীষ্মোপযোগী পোষাক পায়ে সুন্দর পালিশ করা জুতো। "আমি আপনাকে দেখতে এলাম", তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ সহৃদয়তার সঙ্গে কলেজীয় ছাত্রের ধরনে আমার হাত ধ'রে বললেন। "আমি রোজই আপনার কথা শুনি এবং আমি বহুদিন থেকে মনে করেছি যে এসে আপনার সঙ্গে একদিন আন্তরিকভাবে আলোচনা করব। সহরের জীবনে ভয়ঙ্কর একঘেয়েমি, এমন কোন লোক নাই যার সঙ্গে কথা ব'লে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কি অসম্ভব গরম!" তিনি কোট খুলে ব'সে পড়লেন— গায়ে থাকল শুধু সিল্কের সার্ট। "আসুন, আমরা আলোচনা করি!"

আমারও বিরক্তি ধ'রে গেছিল—আমি গৃহচিত্রকরদের সঙ্গ ছাড়া অন্য সঙ্গী খুঁজছিলাম। তাঁকে দেখে আমি সত্যই আনন্দিত হ'য়েছিলাম।

"গোড়াতেই ব'লে রাখছি" তিনি আমার বিছানায় ব'সে বল্লেন, "আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং আপনার বর্তমান জীবন-যাত্রা-প্রণালীর প্রতিও আমি পরম শ্রদ্ধাবান। সহরে সবাই আপনাকে ভুল বোঝে—আপনাকে বুঝবার মত কেউ নাই কারণ জানেন ত পৃথিবীটা গোগল-বর্ণিত শকুরের মুখে ভর্তি। কিন্তু বন ভোজনের দিন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি? আপনি মহৎ ব্যক্তি, সাধু উদার হৃদয়! আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি এবং আপনার সঙ্গে করমর্দন-করা আমি গৌরবের বিষয় ব'লে মনে করি। এত সহজে এবং হঠাৎ জীবন-যাত্রা বদ্লাতে আপনাকে নিশ্চয়ই প্রবল আধ্যাত্মিক বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল এবং এখন এই নতুন জীবন যাপন করাতে আপনাকে নিশ্চয়ই অনবরত মন এবং হৃদয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে হ'চ্ছে। এখন দয়া ক'রে আমাকে একটা কথার জবাব দিন। আচ্ছা আপনার এই ইচ্ছাশক্তি, এই কর্মতৎপরতা আপনি যদি অন্য কিছুর উপর ব্যয় করতেন—ধরুন না কেন আপনি যদি বড় পণ্ডিত কিংবা শিল্পী

হবার চেষ্টা করতেন — তাহ'লে আপনার জীবন কি অনেক বেশী সমৃদ্ধ, গভীর ও ফলপ্রসূ হ'তো না?" আমরা কথা ব'লে চল্‌লাম। এখন আমরা কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে কথা বলছিলাম। তখন আমি নিজের মতবাদ প্রকাশ করলাম। শ্রমের প্রয়োজন এই জন্য যে শক্তিমান যেন দুর্বলকে দাস করিতে না পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠরা যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠদের গলগ্রহ হ'য়ে মধুর রসটুকু নিঃশেষে পান না করতে পারে। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম থাকা উচিত নয় — প্রত্যেক লোকই নিজের জন্য শ্রম করবে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কায়িকপরিশ্রম এবং বাধ্যতামূলক সেবার মত সাম্য প্রবর্তক আর কিছু নেই।

"আপনি তবে মনে করেন" ডাক্তার বল্লেন, "যে বিনা ব্যতিক্রমে সবারই কায়িক পরিশ্রম করা উচিত?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমার মনে হয় না যে সবাই — চিন্তাশীল লেখক এবং শিল্পী, বৈজ্ঞানিক — যদি [illegible] জীবন [illegible] — যদি [illegible] রঙ্ দেয়, তবে সেটা সভ্যতার অপ্রগতির পথে একটা ভয়ঙ্কর বাধা হ'বে?"

"বিপদ কোথায়?" আমি বল্লাম। "প্রেমের এবং নৈতিক" বিধানের পূর্ণ সাধনই অগ্রগতি। আপনি যদি কাউকে দাস না করেন এবং নিজে যদি কারও উপর ভারস্বরূপ না চাপেন — তবে এর চেয়ে বড় অগ্রগতি আর আপনি কি চান?"

"কিন্তু দেখুন!" হঠাৎ রাগাভো রেগে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। "আমি বল্‌ছি যে যদি কোন শামুক নিজের খোলসের মধ্যে থেকে নৈতিক বিধান অনুযায়ী আত্ম-শুদ্ধি করতে থাকে, তবে সেটাকে কি আপনি অগ্রগতি বল্‌বেন?"

"কিন্তু কেন?" আমি কোণ-ঠাসা হ'য়ে প'ড়েছিলাম। "যদি আপনার প্রতিবাসিদের আপনাকে খাওয়াতে না হয় পরাতে না হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করতে না হয়, তবে দাসত্বের ভিত্তির উপর স্থাপিত জীবনে সেইটাকে উন্নতি বলব। আমার মত হ'চ্ছে যে এইটাই সত্যিকারের সম্ভবপর প্রয়োজনীয় অগ্রগতি!"

"বিশ্বের অগ্রগতি যে অগ্রগতিতে সব মানুষেরই অধিকার আছে — তার সীমা হ'চ্ছে অসীমের মধ্যে। আমাদের প্রয়োজন এবং ঐহিক ধারণার দ্বারা সীমাবদ্ধ 'সম্ভবপর' অগ্রগতির কথা আমার কাছে যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকে।"

"আপনার কথামত অগ্রগতির সীমা যদি অসীমের মধ্যে হয়, তাহ'লে তার মানে

এই যে এর গন্তব্যস্থান অনির্দিষ্ট" আমি বল্‌লাম। "ভেবে দেখুন, কেন বেঁচে আছি সেটা নিশ্চিত না জেনে, বেঁচে থাকাটা কি অদ্ভুত!'

"কেন? 'না-জানা'টা আপনার জানার মত বিরক্তিকর নয়। আমি একটা মইয়ে চড়ছি যার নাম হ'চ্ছে অগ্রগতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি! আমি চ'লেছি ত চ'লেছিই—জানি না কোথায় যাবো, কিন্তু এই অপূর্ব মইয়ে আরোহণের জন্য বেঁচে থাকাটাই ত সার্থক। আর আপনি নিশ্চিতরূপে জানেন কেন আপনি বেঁচে আছেন—আপনি জানেন যে কারও কাউকে দাস করা উচিত নয়, যে শিল্পী এবং যে-লোকটা রঙ্‌ মিশায় দুজনেরই সমান ভাল ভোজ পাওয়া উচিত। কিন্তু ওটা ত জীবনের বুর্জোয়াদিক—শুধু মাত্র রান্নাঘরের দিকটা—শুধুমাত্র এর জন্য জীবনধারণ করাটা বিরক্তিকর নয় কি? যদি কোন পোকা অন্য পোকা খায়, তাকে শয়তানে ধরুক্‌, তাকে থাক্‌তে দাও। আমাদের তাদের কথা ভাব্‌লে চল্‌বে না—আপনি যতই তাকে দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা করুন, সে মর্‌বেই — দূর ভবিষ্যতে মানব-জাতির জন্য যে স্বর্ণযুগ অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের শুধু সেই কথা ভাবা উচিত।"

ব্লাগোভো উত্তেজনার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিলেন কিন্তু কি একটা বাইরের চিন্তা যেন তাঁকে বিব্রত কর্‌ছিল।

"আপনার বোন এখনও আস্‌ছেন না" তিনি ঘড়ি দেখে বল্‌লেন। "কাল তিনি আমাদের বাড়ী গেছিলেন — বলেছিলেন যে আজ আপনাকে দেখ্‌তে আস্‌বেন। আপনি শুধু 'দাসত্ব' 'দাসত্ব' করেন" তিনি বলে চল্‌লেন, "কিন্তু এটা একটা বিশেষ প্রশ্ন, আর মানবজাতি এইসব প্রশ্নের সমাধান ধীরে ধীরে করে।"

আমরা ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে লাগ্‌লাম। আমি বল্‌লাম যে প্রত্যেক লোক নিজে ভাল মন্দ সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধান করে—মানবজাতি ধীরে ধীরে এ প্রশ্নের সমাধান কর্‌বে এজন্য কেউ ব'সে থাকে না। মানবীয় ভাবধারা বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্য এক প্রকারের ভাবধারাও ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করে। দাসত্বের শেষ হ'য়েছে-ধনতন্ত্র বৃদ্ধিলাভ কর্‌ছে। মুক্তির মন্ত্রের পরম ঋদ্ধির সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ব্যাটের সময়ের মত সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে—রক্ষা কর্‌ছে কিন্তু তারা নিজেরা অভুক্ত, নগ্ন এবং অরক্ষিত। এই রকমের পরিস্থিতি আপনার সমস্ত ভাবধারা এবং আন্দোলনের সঙ্গে চমৎকার খাপ খায় কারণ দাসত্ব—শিল্পও ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ কর্‌ছে। আমরা আস্তাবলের চাকরদের আর বেত মারি না কিন্তু দাসত্বকে আমরা আরও সংস্কৃত রূপ দেই। অন্ততঃপক্ষে আমরা প্রত্যেক ব্যাপারে এটাকে সমর্থন কর্‌তে পারি। ভাবধারা আমাদের কাছে ভাবধারাই থেকে যায়; কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা যদি শ্রমিকদের উপর আমাদের সব

অপ্রিয় দৈহিক কার্য্যকে চাপিয়ে দিতে পারতাম—তবে তাই দিলাম এবং অবশ্য আমরা এটাকে সমর্থন করতাম এই ব'লে যে কবি শিল্পী পণ্ডিত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকদের যদি এই সব কাজে সময় নষ্ট করতে হয় তবে অগ্রগতির পথে ভয়ানক বাধা স্থষ্টি হবে।

ঠিক সেই সময়ে আমার বোন এল। সে যখন ডাক্তারকে দেখল তখন তাকে আমি উত্তেজিত এবং বিব্রত দেখলাম—সে বল্‌তে লাগ্‌ল যে তাঁকে তখনই বাড়ীতে বাবার কাছে যেতে হ'বে।

"ক্লিয়োপেট্রা অ্যালেক্সিয়েভ্‌না" ব্লাগোভো গভীর আবেগে বুকে হাত দিয়ে বললেন, "আপনি যদি আধঘণ্টা আমার এবং আপনার ভাইয়ের সঙ্গে কাটান তবে আপনার বাবার কি হ'বে ?" তিনি বেশ সরল প্রকৃতির লোক এবং নিজের আনন্দ অন্যের মধ্যে সংক্রমিত কর্‌বার ক্ষমতা তাঁর ছিল। আমার বোন এক মুহূর্ত্ত ভাবল—তারপর হঠাৎ অতর্কিত ভাবে হেসে সে খুব আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল—যেমন হয়ে ছিল সেই বনভোজনের দিনে। আমরা মাঠে গিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে আলাপ করতে লাগ্‌লাম—সহরের পশ্চিমমুখী জানালা গুলোয় তখন অস্তমান সূর্যের সোনালী সমারোহ।

তারপর প্রত্যেকবার আমার বোন যখন আমায় দেখতে আস্‌ত-তখন ব্লাগোভোও এসে হাজির হ'তেন—তারা পরস্পরকে এমন ভাবে সম্ভাষণ করত যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের দেখা হ'য়েছে। ডাক্তার এবং আমি তর্ক কর্‌তাম—আমার বোন ব'সে শুন্‌ত—তার মুখে সানন্দ সাবেগ সপ্রশংস উৎসুক ভাব। আমার মনে হ'ত যে তার চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ ধীরে ধীরে চলে' যাচ্ছিল—এমন একটা জগৎ যা' সে স্বপ্নেও কোন দিন দেখে নি'—আজ তারই কল্পনা কর্‌ছিলো সে ; যখন ডাক্তার থাক্‌তেন না তখন সে শান্ত বিষন্ন হ'য়ে থাকৃত—আর যদি সে আমার বিছানায় বস্‌ত, তবে মাঝে মাঝে কাঁদ্‌ত—কান্নার কারণ কি তা' সে বল্‌ত না।

আগস্ট্‌ মাসে র‍্যাডিশ্‌ আমাদের রেলওয়েতে যাবার আদেশ দিল। আমরা সহরের বাইরে যাবার দু'দিন পূর্বে বাবা আমায় দেখতে এলেন। তিনি ব'সে আমার দিকে না তাকিয়ে তাঁর লাল মুখ মুছ্‌তে লাগ্‌লেন—তারপর পকেট থেকে স্থানীয় সংবাদ পত্র খানি বের ক'রে প্রত্যেকটি কথার উপর জোর দিয়ে যেখবরটা পাঠ কর্‌লেন তার মর্ম এই যে আমারই সমবয়সী একজন সহপাঠী, স্টেট্‌ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের ছেলে, রাজস্ববিভাগীয় আদালতের প্রধান কেরানী পদে নিযুক্ত হ'য়েছে।

"আর তোমার নিজের দিকে তাকাও" তিনি কাগজখানা ভাঁজ করে বল্‌লেন। "তুমি ভিক্ষুক, ভবঘুরে, বদ্‌মায়েস ! শ্রমিক এবং কৃষকরাও লেখাপড়া শেখে ভদ্র হ'বার

ভার দেওয়া হ'য়েছিল একজন ঠিকাদারের উপর—সে ভার দিয়েছিল আরেক জনকে—এ লোকটা আবার ভার দিয়েছিল র‍্যাডিশকে শত করা ২০ কোপেক্ কমিশনের লোভ দেখিয়ে। কাজটা এমনই লাভের ছিল না—তার উপর এল বৃষ্টি; সময় নষ্ট হ'তে লাগ্‌ল—আমরা কাজ কর্‌তাম না অথচ র‍্যাডিশকে আমাদের মাইনে জোগাতে হ'ত। বুভুক্ষু গৃহচিত্রকররা র‍্যাডিশকে মার্‌ত আর কি—তারা তাকে জুয়াচোর, রক্ত-পায়ী, জুডাস্ প্রভৃতি ব'লে গাল দিত; হতভাগ্য র‍্যাডিশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশায় আকাশের দিকে হাত তুল্‌ত আর ঘন ঘন মির্সেস্ শেপ্রাকভের কাছে যেত টাকা ধার কর্‌তে। (ক্রমশ)

"বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়। এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করেনা। স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে বিদ্যা কখনও অক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

গৃহকোণ

[এখানে কেবল মেয়েদের কথা মেয়েরা বলবেন]

রেখা দেবী

এই কয়েকখানি পাতার মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে আমাদের সখ্য—এরই ভিতর দিয়ে আমরা করবো পরস্পরকে নানা ভাবে সাহায্য—এনে দেব পরস্পরের মনে নতুন শক্তি ও সাহস—দূর করবো আমাদের সঙ্গীহীনা বোনেদের নিঃসঙ্গতা—জাগিয়ে তুলবো সবার মনে আমাদের একান্ত নিজস্ব এই বিভাগটীর প্রতি অনুরাগ; এমনি উদ্দেশ্য নিয়েই এটীকে গড়ে তোলবার ভার নিয়েছি। আশা আছে আমার সহৃদয় পাঠিকাদের সাহায্যে এ গুরু-ভার বহন করবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারবো এবং ক্রমে এই বিভাগটীকে এমন সুপরিচিত ও বিখ্যাত করে তুলবো যে তখন অনেকের কাছেই, অন্ততঃ বেশীর ভাগ গ্রাহিকাদের, কাছে 'নাচঘরের' অন্যতম আকর্ষণ হবে 'গৃহকোণ'।

কিন্তু একলা সেই মহৎ 'কল্পনা'কে বাস্তবে পরিণত করার দুঃসাহস যে একান্তই "দুঃসাহসিকতা" সে কথা আমার 'কল্পনা-রঙ্গীন' মনের কাছের অজ্ঞাত নয়—তাই প্রথম দিনেই ঠিক করলাম 'আর্জ্জি' পেশ করবো আমার সমবেত পাঠিকাদের কাছে, তাঁদের সাহায্য চেয়ে। আমাদের এই বিভাগটী যাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সেই জন্যই চাইছি আপনাদের সহায়তা। পাঠিকাদের কাছ থেকে সেলাই, রান্না, শিশু-পালন, স্বাস্থ্য মূলক, পোষাক-পরিচ্ছদ, ও অন্যান্য হাতের কাজ, ইত্যাদির ওপর, যা যা মেয়েদের পক্ষে দরকারী এমন রচনা সাদরে আমরা গ্রহণ করবো এবং মনোনীত রচনা এখানে প্রকাশিত হবে—কেবল রচনা যাঁরা পাঠাবেন তাঁদের এবং আমাদের সুবিধার জন্য দু'টী কথা তাঁদের মনে রাখতে অনুরোধ করি প্রথম—তাঁরা যেন সর্ব্বদা যে রচনা পাঠাবেন তার নকল রেখে তবে তা পাঠান,—আর দ্বিতীয়—রচনা যেন খুব বেশী বড় না হয়—আবার নেহাৎ দু'চার লাইন হলেও চলবে না—মাঝামাঝি হওয়াই ভালো,—আর সর্ব্বদা কাগজের একপিঠে লিখবেন। তাছাড়া আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এই বিভাগের বিষয় কোন কিছু জানতে বা এর উন্নতি-কল্পে জানাতে চান তবে—সম্পাদক মহাশয়ের নামে, 'নাচঘরের' ঠিকানায়—'গৃহকোণ'—নাচঘর কার্য্যালয়, ৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি দিলেই আমার হাতে তা যথা সময়ে পৌঁছবে, এবং রচনাও ঠিক এই ভাবে এই ঠিকানাতেই পাঠাতে হবে।

অবসর বিনোদন

আমি জানি যে অবসর বড় একটা গৃহস্থ সংসারের গৃহিণীর মেলে না কিন্তু তবুও যে এই অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা হল তার কারণ সংসারের গৃহিণীর হাতে দু' মিনিট নিশ্চিন্তে বসে একটা কাজ করবার মত 'সময়' আর কোন সময় মিলুক আর নাই মিলুক, দুপুর বেলা গৃহস্বামী আফিসে এবং বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ইস্কুলের গণ্ডির মধ্যে আটক থাকায় প্রায় সব বাড়ীতেই মেয়েরা ঐ সময় একটু ফাঁক পান নিজেদের ইচ্ছা মত ২।৪ টা কাজ করবার—অনেকে অবশ্য নিদ্রাদেবীর আরাধনা করেই সে সময়টা কাটান কিন্তু অনেকে আবার তা সেলাই, আঁকা, ইত্যাদি কোন না কোন একটা শিল্প-কর্ম্মের সাধনায়ই কাটান। কন্যার মাতারা বসেন মেয়েদের ছাট্-কাট্, বোনা এমব্রয়ডারি ইত্যাদি শিক্ষার তদারক করতে—আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও পেড়ে বসেন ঐ রকম কিছু একটা কাজ বা বাড়ীর ছোট খোকা-খুকির অর্দ্ধ-নির্ম্মিত জামা কাপড় – এক কথায়, এ সময় অধিকাংশ ঘরেই চলতে থাকে সূচিকর্ম্মের চর্চ্চা – কারণ 'সেলাই' জিনিষটা মেয়েদের সখের জিনিষও বটে, আবার ওর দ্বারা সংসারের সাহায্যও হয় অনেক। তাছাড়া বিবাহযোগ্য কন্যাদের এটী একটী বিশেষ গুণ হিসাবে বিয়ের সময় গণ্য করা হয় বলেই বোধ করি এর এত আদর! মোট কথা দরকারেই হোক অদরকারেই হোক এই সূচি-কর্ম্মকে আশ্রয় করেই অধিকাংশ বাঙ্গালীর ঘরে দ্বিপ্রাহরিক-অবসর-বিনোদন করা হয়—তখন এই প্রিয় এবং আবশ্যকীয় বস্তু সেলায়ের জন্য সাধারণ যা যা দরকার হয়, সেগুলি খোঁজাখুঁজি করে যাতে বৃথা সময় নষ্ট না হয় সেই উদ্দেশে আজ কেমন করে অতি সামান্য খরচায় একটি সুন্দর সেলাইএর সরঞ্জাম রাখার বাক্স তৈরী করতে পারা যায় সেই উপায়টাই বলে দেব ঠিক করেছি। এটী তৈরী হবার পর আর প্রতিদিন সেলাই নিয়ে বসবার আগে—সূতোর রীল কোথা ? কাঁচি কই ?—ব'লে সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াতে হবে না।

সূচি-কর্ম্মাধার

উপকরণ : - একটী সাধারণ পুরণো ছোট অ্যাটাচিকেশ, ১½ গজ মোটা সূতি ছিট, গজ ২ ইলাস্টিক। ১½ গজ প্লেন রঙ্গিন অপেক্ষাকৃত পাতলা রঙ্গীন কাপড়, কিছু ভালো ঘন আঠা—একটী ধারালো কাঁচি, ছিটের কাপড়ের সঙ্গে রং মেশানো কিছু সূতো, ছুঁচ এবং বাক্সটীর ভিতরকার তলা, চার পাশের দেওয়াল, এবং উপরের ডালার ভিতরকার চৌক স্থানটীর মাপে ৬ টুকরা মোটা শক্ত পিস্‌বোর্ড।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে বাক্সটীতে কাপড় মোড়বার আগে তার হ্যাণ্ডেলটী খুলে ফেলতে হবে। তার পর ছিটের কাপড়টী থেকে এমন লম্বা ফালি কেটে বার করে নিতে হবে যেটীর দ্বারা অনায়াসে

বাক্সটীকে ডালার উপর থেকে সামনের দিক পর্য্যন্ত খুলে ফেলা যাবে—চওড়ায় এ টুকরোটী হবে বাক্সটীর চেয়ে ২ ইঞ্চি চওড়া—এবং সেই ২ ইঞ্চি বেশী কাপড়ের মধ্যে থেকে ১ ইঞ্চি কাপড় মুড়ে ফেলে তার উপর গরম ইস্ত্রি চালিয়ে ভাঁজটী বেশ কায়েমী করে নিয়ে সে টুকরোটী একধারে সরিয়ে রেখে দিন। এর পর ডালার এবং বাক্সের ডান ও বাঁ পাশের দেওয়ালে সেই কাটা (অল্প বড়) ছিটের কাপড়ের টুকরো ৪ খানি বেশ করে আঠা মাখিয়ে এক ধার বাক্সের তলায় ও অপর দিক বাক্সের ভিতর মুড়ে দিয়ে আটকে দিন। যখন আঠা শুকিয়ে গিয়ে সেগুলি যথাস্থানে আটকে যাবে, তখন যে বড় কাপড়ের টুকরোটী ২ পাশে ভাঁজ দিয়ে ইস্ত্রি করে সরানো আছে সেইটীর দ্বারা বাক্সটী আগা গোড়া মুড়ে ফেলতে হবে—বাক্সর সামনের দিকটায় ভিতর দিকে আঠা লাগিয়ে বাইরে থেকে প্রায় ১ ইঞ্চি চওড়া কাপড় ভিতর দিক দিয়ে আঠার উপর চেপে বসিয়ে আটকে দিয়ে বাক্সের পিছন দিকে বাইরেটায় ও তালার ঠিক নিচের অংশ আঠা লাগিয়ে বেশ করে খাঁজে খাঁজে কাপড়টী বসিয়ে পরে ডালার উপর দিয়ে কাপড়টী বেশ টান করে নিয়ে গিয়ে ভিতর দিকে আঠায় আটকে দিতে হবে—এর পর আঠা শুকোবার জন্য বাক্সটী সরিয়ে রেখে দিন। এইবার বাক্সটীর ভিতরের দিকে তলায় ও চারপাশের অংশে মাঝে মাঝে কাটা যে পিস বোর্ডগুলি আছে তাতে এ.ক একে প্লেন কাপড়টীর টুকরো থেকে কেটে কেটে কাপড় জুড়ে ফেলতে হবে—পিসবোর্ডগুলির সামনে কাপড় থাকবে আর পিছন দিকে ধারে ধারে আঠা দিয়ে সামনের দিক থেকে কাপড় টেনে নিয়ে মুড়ে মুড়ে আটকে দিতে হবে। কেবল যে টুকরোটী ভিতরে সামনের দিকে আটকানো হবে তাতে কাপড় মোড়বার আগে সেই কাপড়ে পাশাপাশী ৪টী সূতোর রীল যার মধ্যে আটকে রাখা যাবে এমন মাপ করে লম্বা করে এক টুকরো ইলাস্টিক আটকে দিয়ে তার সেটী পিসবোর্ডে মুড়বেন—আর বাক্সর ডালার ভিতরের মাঝের পিসবোর্ডটীতে ও কাপড় মোড়বার আগে সে কাপড়ের ২ পাশে ২টী ইলাস্টিকের টুকরো সেলাই করে নিতে হবে—সবগুলিতে কাপড় মোড়া হলে টুকরোগুলি কিছুক্ষণ কয়েকখানা ভারী বইয়ের তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিলে আটকানোর কাজটা ভালো ভাবে হবে—সেগুলি যতক্ষণ চাপা থাকবে সেই ফাঁকে বাক্সটী কাছে নিয়ে ছিটের কাপড়ের সঙ্গে রং খেলানো সূতো দিয়ে তার প্রত্যেকটী কোণ 'বখেয়া' সেলাই দিয়ে কাপড়ের টুকরোগুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগ দিয়ে দিন।

এই বার বাক্সের ডালায় বেশ করে আঠা লাগিয়ে তাতে তার মাঝের টুকরোটী চেপে বসিয়ে দিন সামনের দিকে দেখা যাবে সুন্দর একটী এক রঙ্গা কাপড়ের টুকরোয় আঁটা জিনিষ পত্র রাখবার উপযোগী ইলাস্টিকের স্ট্র্যাপ—ক্রমে ক্রমে এই ভাবেই আগে

ভিতরে আঠা মাখিয়ে নিয়ে পরে একে একে টুকরোগুলি আটকে দিয়ে দিয়ে বাক্সটার তলা ও চার পাশ ঢেকে ফেলুন—এর পর আর ভিতর দিকের জীর্ণ অবস্থা বা দাগ কিছুই চোখে পড়বে না—সুন্দর, পরিষ্কার ও নতুন দেখাবে।

কাঠামো তো তৈরী হল, এই বার ব্যবস্থা করা দরকার তার 'অলঙ্কারের'। প্রথমে যে ছিট দিয়ে বাক্সটী মোড়া হয়েছে তারই ছাঁট থেকে তেমনি করে একটা ছুঁচ গেঁথে রাখবার জন্য বালিশ তৈরী করে টেপ দিয়ে ডালার নিচের অংশে ভিতর দিকে ঝুলিয়ে দিন—তারপর আস্তে আস্তে এটীকে সেলাইয়ের দরকারী সব-জিনিষপত্র দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলুন—তলায় গাঁথা ইলাস্টিকের আবেষ্টনে আটকে রাখুন কাঁচি, রেশমের গোছা, কয়েকটী আঙ্গুলত্রাণ,—মাপ নেবার টেপ-রিপু করবার সুতোর কয়েকখানা কার্ড।—পিন-কুশনে আটকে দিন সরু মোটা ছুচ্ ও কয়েকটি আলপিন্—বাক্সের ভিতর সামনের দিকে ইলাস্টিকের মধ্যে বসিয়ে দিন সাদা ও রঙ্গীন ৪টী সুতোর রীল, পাছে রীলগুলি গড়িয়ে গিয়ে সেলায়ের কাটা কাপড় ইত্যাদির মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে সেই জন্যই তাদের ইলাস্টিক দিয়ে যথাস্থানে আটকে রাখার এই আয়োজন—আর বাক্সের ভিতরে সেলায়ের ফ্রেম্ কাপড়, এমব্রয়ডারীর বই, ইত্যাদি যদি গুছিয়ে রাখা যায় তাহলে আর কোন জিনিষই দরকারের সময় খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না। ডালাটা সহজে খোলা বন্ধর ব্যবস্থার দরুণ তার সামনে ছোট এক টুকরো কাপড় সেলাই করে দেওয়া হয়েছে।

জানেন কি?

কমলা লেবুর খোলা আগুনের ধারে রেখে বেশ করে শুকিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে যে পাত্রে শুকনো চা রাখা আছে তার মধ্যে ফেলে রাখলে সে চায়ে চমৎকার গন্ধ ও তার স্বাদ অনেক ভালো হয়?

পাতি লেবু মাঝা মাঝি কেটে কাঁটা দিয়ে তার কয়েক জায়গায় বিঁধে নিয়ে রস বার করলে আর তাতে এক ফোঁটাও রস থেকে যেতে পারে না?

কোন বোনা জিনিষ থেকে পশম খুলে সেই পশম আবার বোনবার আগে যদি একটী বোতলে খানিকটা ফুটন্ত জল ভরে সেই বোতলের গায়ে আঁট করে মিনিট কয়েক জড়িয়ে রাখা যায় তাহলে সব ভাঁজ খুলে গিয়ে তা নতুন পশমের মত সিধে হয়ে যায়?

বোতলের ভিতরে কোন দাগ ধরে গেলে তাতে ডিমের খোলা টুকরো টুকরো করে ভ'রে দিয়ে অল্প জল দিয়ে বেশ করে ঝাঁকালে দাগ উঠে যায়?

পরিচয়

গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বাংলাসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত কর্মী। তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা বহুমুখী: গল্প, উপন্যাস এবং কবিত লিখে তিনি আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন। তিনি যে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ সাহিত্যেও একজন কৃতী লেখক তার চাক্ষুষ প্রমাণ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা। সাহিত্যিকের লেখা এই সাহিত্য-সমালোচনার বইখানিতে অনেক কিছু পাব ব'লেই আশা ক'রেছিলাম—বল্‌তে আনন্দ বোধ কর্‌ছি যে, সে আশা সফল হ'য়েছে। বাংলা সাহিত্যের এমন একখানি ইতিহাস রচনা ক'রেছেন যা'র ফলে তিনি পথ-প্রদর্শকের সম্মান দাবী কর্‌তে পারেন।

জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা যায় প্রধানত দুই প্রকারে: এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পথ ধ'রে, আর সাহিত্য-সমালোচনার পথ ধ'রে। প্রথম জাতীয় সাহিত্য-ইতিহাসে আমরা পাই জাতীয় সাহিত্যের কাঠামোর ইতিহাস—প্রাণের সন্ধান এতে পাওয়া যায় না। এটাকে বলা চলে ফসিলের ইতিহাস। আর দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্যের ইতিহাস জাতীয় সাহিত্যের প্রাণের ইঙ্গিত দেয়: সৃষ্টিমূলক সমালোচনার থেকেই এই রকমের সাহিত্য-ইতিহাস রচিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ইতিহাস রচনায় লেখকের সত্যিকার সমালোচনা-প্রতিভার প্রয়োজন হয়। ইংরেজী সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিলেই বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে: কম্পটন্ রিমেটের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস আছে—আবার সেণ্টস্‌ব্যেরী এবং লেগুইও ফাজামিয়ারও ইতিহাস আছে। কিন্তু এর সবগুলোই কি এক পর্য্যায়ের? তা' কখনো নয়। রিকেটের সূক্ষ্ম সমালোচনা প্রতিভা ছিল না ব'লে তাঁর রচিত ইংরেজীসাহিত্যের ইতিহাসে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু সাহিত্যের প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সেণ্টস্‌ব্যেরী কিংবা লেগুই ও ফাজামিয়াঁর রচনা অন্য জাতের জাগরণ। এঁরা ছিলেন রস-বোদ্ধা সমালোচক: তাই এঁদের রচিত সাহিত্যের ইতিহাস প্রাণরসে পরিপুষ্ট এবং তাঁদের রচনা সাহিত্যের পর্য্যায়ে উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা রচনায় নন্দগোপালবাবু এই দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণ ক'রেছেন: ইতিপূর্বে এই পথ অনুসরণ ক'রে আর কেউ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ক'রেছেন ব'লে জানা নেই। এদিক দিয়ে নন্দগোপালবাবু পথ-প্রদর্শকের সম্মান দাবী কর্‌তে পারেন।

যদিও ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের বহু ইতিহাস রচিত হ'য়েছে তবু বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার প্রচুর অবকাশ আছে। কম ক'রে হ'লেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের পুরাণো। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিই এই হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রেছেন এবং অনেক

প্রামাণ্য গবেষণা-মূলক পুস্তকও লিখেছেন। কিন্তু এঁরা সকলেই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পথ ধ'রে গেছেন; ফলে এঁরা সাল তারিখ নিয়ে অনেক মারামারি ক'রেছেন বটে কিন্তু কেউ সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এই হাজার বছরের ইতিহাসকে যাচাই ক'রে দেখেন নি। তাঁদের গবেষণা সার্থক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বই সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে নি'। সাহিত্যিক নন্দগোপালবাবু সাহিত্যিকের দৃষ্টি দিয়ে এ বই লিখেছেন ফলে বাংলা সাহিত্যের ভূমিকায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আছে—নতুন পথের সন্ধান আছে। নিছক সন তারিখের গবেষণা নিয়ে তিনি কোথাও মাথা ঘামান নি'। সমাজ এবং রাষ্ট্রের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে অবলম্বন ক'রেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং এই বিশেষ অবস্থাগুলির বিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যেরও বিবর্তন হয়। নন্দগোপাল বাবু এই বিশেষ অবস্থাগুলির সূত্র সন্ধান ক'রে সাহিত্য সমালোচনায় অগ্রসর হ'য়েছেন—তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুনত্ব আছে। আলোচ্য বিষয় তিনি দুইভাগে বিভক্ত ক'রেছেন: প্রাচীন কাল ও আধুনিক কাল। চর্যাপদ এবং বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত কাব্য থেকে শুরু ক'রে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন কাল এবং ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকে আধুনিক কালের শুরু। প্রচলিত লৌকিক ধর্মই প্রধানত প্রাচীন কাব্যের উপজীব্য হওয়ায়, প্রাচীন কাব্যের সমালোচনায় অপেক্ষাকৃত কম পৃষ্ঠা ব্যবহার ক'রেছেন। আধুনিক সাহিত্য ঢের বেশী ব্যাপক এবং জটিল: সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে এ সাহিত্যের সৃষ্টি—তাই এর সমালোচনাও ব্যাপক এবং জটিল। সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে নন্দগোপাল বাবু এই সব সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন ক'রেছেন। আটটি বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রায় তিনশত পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার তাঁর সমালোচনা শেষ ক'রেছেন।

পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে নন্দগোপালবাবু নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সাহিত্যের ইতিহাসখানি রচনা ক'রেছেন। ফলে তাঁর নিজের পথ তাঁর নিজেকেই ক'রে নিতে হ'য়েছে। প্রথম পথ প্রদর্শক হিসাবে ভুল ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং আছেও। তবু বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা যে একখানি যুগান্তকারী বই সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিকের নির্মম সমালোচনা করতে তিনি যেমন কুণ্ঠিত হন নি' আবার তেমনই অনাদৃত প্রতিভাকে সম্মান দেখাতেও তিনি বিরত হন নি'। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বংকিমচন্দ্রের আদর্শবাদকে তিনি আক্রমণ ক'রেছেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষের মহাকবিত্বকে তিনি স্বীকার করেন নি' আবার ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভাকে তিনি লোকচক্ষুর সাম্‌নে নতুন ক'রে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই নির্ভীক সমালোচনা সত্যই প্রশংসনীয়। আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনায় তিনি দু'এক ক্ষেত্রে যে অবিচার করেন নি' এমন নয়: এমন দু'এক জন লোককে তিনি অনাবশ্যক প্রাধান্য দিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁদের দাবী সর্বজনগ্রাহ্য নয়; কয়েকজন প্রতিভাবান লেখকের নাম করতেও তিনি ভুলে গেছেন। মোট কথা গ্রন্থকারের অতি আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা সম্পূর্ণ এবং অপক্ষপাত নয়। আমরা আশা করি লেখক ভবিষ্যৎ সংস্করণের অতি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে' দিতে ভুলবেন না। এই সব দু'একটি ছোটখাটো দোষত্রুটি ছেড়ে দিলে বইটি যে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হ'য়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে অধ্যায়টির সারাংশ ক'রে দেওয়াতে, বইটির মূল্য আরও বেড়ে গেছে। বাংলার সাহিত্যানুরাগী প্রত্যেক

ছাত্র এবং শিক্ষকের পক্ষে এ বইখানি অবশ্য পাঠ্য। বইয়ের অঙ্গ সজ্জা এবং মুদ্রন পারিপাট্য প্রশংসনীয়। তিনশত পৃষ্ঠার এই বৃহৎ সাহিত্য ইতিহাসখানির দুইটাকা মূল্যও খুব সুলভ বল্‌তে হ'বে।

গোপাল ভৌমিক

হালখাতা রামপ্রসাদ মিত্র ও অসীম দত্ত সম্পাদিত। দাম এক টাকা।

ছোটদের জন্যে কতকগুলি গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা একসঙ্গে ক'রে ছাপানো এই বইটি আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। বিশিষ্ট, প্রখ্যাত, স্বনামধন্য বিস্তর লেখকের লেখা এতে আছে। সম্পাদনা কাজটা হয়ত কেবল কতকগুলি লেখা সংগ্রহ ক'রে পাশাপাশি ছাপানো ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েকটি অর্বাচীনের বিকৃত মস্তিষ্কের জল্পনায় এই বই বেরিয়েছে। সহজেই বোঝা যায়, যাঁরা এতে লেখা দিয়েছেন তাঁরা স্বেচ্ছায় দেন্‌ নি। কাকুতি-মিনতি তোষামোদ করজোড় কৃপাভিক্ষা নামক কতকগুলি অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্রের আক্রমণে ঘায়েল হ'য়ে কিংবা আক্রমণের ভয়ে লেখা দিয়ে তাঁরা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশীল রায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির লেখাগুলি উল্লেখ-যোগ্য। সম্পাদকদ্বয়ের দাদু (?) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ও প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাণীও পত্রস্থ দেখলুম।

মঞ্জু সেন

পাঠাগার—শোকহরণ রায় ও অনিল মৈত্র সম্পাদিত। বালিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

পাঠাগার-আন্দোলনের একমাত্র পত্রিকা। আমরা পত্রিকাখানির নির্ভীক ও স্পষ্ট মতবাদের জন্য ইহাকে দায়িত্ববোধসম্পন্ন পত্রিকা বলিতে পারি। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সুশীল রায়

মঞ্চ

নাট্যনিকেতনে কালিন্দী

গত ১২ই জুলাই শনিবার নাট্যনিকেতনে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু প্রশংসিত কালিন্দী নামক উপন্যাস খানির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হ'য়েছে। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন গ্রন্থকার স্বয়ং এবং গান ও সুর দিয়েছেন কাজি নজরুল ইসলাম।

একই গ্রামের পাশাপাশি দুইটী জমিদার বাড়ীর পারিবারিক ঘটনা ও ঐ দুই জমিদারীর অন্তর্গত কালিন্দী" নামক নদীর ভাঙনে সদ্যোত্থিত একটী চরকে কেন্দ্র করে চার অঙ্কে 'এই নাটকের আখ্যান ভাগ রচিত হ'য়েছে।

নাটকটীর আখ্যানভাগ ও ভাষা বেশ মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক কিন্তু নাট্যকার মহাশয় উপন্যাসের ছোঁয়াচ কাটিয়ে উঠতে না পারায়নাটকটীর গতি স্থানে স্থানে হ'য়ে পড়েছে মন্থর—এবং দুই একটী

অনাবশ্যক চরিত্রকে নাটকের অধিকাংশ দৃশ্যে বার বার টেনে আনার ফলে নাটকের প্রধান কয়েকটী চরিত্র হ'য়ে পড়েছে ম্লান। নাটকের অচিন্ত্য এবং সারি এই ছুটীকে অনাবশ্যক চরিত্র বলা যেতে পারে অথচ এদের দুজনকেই নাটকের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশী, পক্ষান্তরে গুণহীন ও উমা যে চরিত্র দুটীকে আশ্রয় করে নাটকের পরিণতি ঘটেছে নাট্যকার সবচেয়ে অবিচার করেছেন সেই দুটী চরিত্রের উপর।

এই দুটী চরিত্র শুধু সুযোগ ও সুবিধার অভাবে কোন স্থানেই মাথা তুলে স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে নি। সারির সংলাপগুলি কতকটা সাঁওতালি ধরণের হলেও তার গান শুনলে মনে হয় সে যেন সাঁওতাল আশ্রিত বাঙ্গালী মেয়ে। আমাদের মনে হয় নাট্যকার যদি এই সামান্য দোষ ক্রটীগুলি একটু সংশোধন করেন তাহলে নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে।

এই নাটকে অভিনয় করেছেন— নরেশ মিত্র, রবিরায়, শৈলেন চৌধুরী, ভূমেন রায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, নরেন চক্রবর্ত্তী, ধীরেন পাত্র, নীহারবালা, ছায়া দেবী, রাধারাণী, ঊষা রাণী, নমিতা প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ।

অভিনয় প্রায় প্রত্যেকেরই ভাল হ'য়েছে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সব থেকে আমাদের বেশী মুগ্ধ করেছেন শৈলেনবাবু বিশেষ করে তাঁর শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে। নরেশ বাবু ও ধীরেন পাত্রের অভিনয় ও চমৎকার হ'য়েছে।

স্ত্রী চরিত্র গুলির মধ্যে নীহার বালা ও ছায়াদেবীর নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। নীহার বালার অভিনয় হ'য়েছে অনবদ্য। ছায়া দেবীকে যাঁরা এতদিন "বাংলার বধূ"……বলেই মনে করে এসেছেন আশাকরি এবারে তাকে ultra modern girl রূপে দেখে তাঁদের সে ধারণা বদলে যাবে।

রঙমহলে রক্তের ডাক

গত ১২ই জুলাই শনিবার রংমহলে বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীযুত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নূতন সামাজিক নাটক 'রক্তের ডাকে'র উদ্বোধন হয়েছে। নাটকটি পরিচালনা ক'রেছেন শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটকের কাঠামো মাঝে মাঝে অসঙ্গতি দোষে একটু নড়বড়ে হ'লেও রক্তের ডাকের মূল চরিত্র দুটি হ'চ্ছে নতুন এবং কতটা দুঃসাহসিক। দুঃসাহসিক কেন বলছি বিশদ করবার চেষ্টা কচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত সাহিত্যে পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় নীতির প্রাধান্য। শরচ্চন্দ্র প্রথম এ দেশী সাহিত্যে 'ভগ্ন জীবনের ওপর দরদ' আমদানী করেন। সমাজের চ'খে পতিতা ও পতিতের অন্তরের ফল্গু ধারার সন্ধান তিনি দেন। প্রেম পরশমণির জয়গানে তাঁর লেখনী মুখর। লৌহকঠিন 'জীবানন্দ' প্রেমের স্পর্শে সোনার ছেলে। প্রেমের এই পরশমণিত্ব, কিমিয়ার পরশমণির মত শুধু কল্পনার সৃষ্টিই কিনা, কাব্যেই শুধু তার স্থান না বাস্তবেও পরিচয় আছে, বলা শক্ত। বাস্তবে কি তা'বলে প্রেম নেই? আছে, কিন্তু পরশমণির গুণ তাতে আরোপ করবার প্রয়োজন আছে কি? বিধায়ক বাবু রক্তের ডাকে প্রেমকে পরশমণি স্বীকার না ক'রে তা আঁকতে চেষ্টা করছেন। দুঃসাহস নয় কি? কিন্তু বিধায়ক বাবু দুঃসাহস প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই কারণ চরিত্র সৃষ্টিতে অসঙ্গতি আছে।

শুভেশ ধনী কায়স্থ জমীদারের ছেলে, বুলু দরিদ্র প্রতিবেশী বামুনের মেয়ে। যে সময় বর্ণবিচার থাকে না, অর্থবিচার থাকেনা স্ত্রী পুরুষ বিচার থাকে না সেই মধুর বাল্যে তাদের সখিত্ব। তারপর বিচা-

রের দিন এলে দুজনের জীবন রেখা ভিন্নমুখী। শুভেশ কলিকাতায় নারীমেধ আর সুরা তর্পণে পিতৃত্ত অর্থ ক্ষয় কচ্ছে, আর বুলু গঞ্জিকা সেবী তৃতীয়বর স্বামীর হাতে প'ড়ে পিতৃদত্ত শিক্ষার প্রায়শ্চিত্ত ক'চ্ছে। এই দুই বিভিন্ন মুখী রেখাকে নাট্যকার মাঝে মাঝে মিলন বিন্দুতে পৌছে দিচ্ছেন।

শুভেশ শেষ পর্য্যন্ত জীবন ধারার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বোধ করেনি। গ্রাম্যবধূ বুলু শতাব্দী রূপে শুভেশের আকর্ষণ পরিমণ্ডল মধ্যগত হ'ল। দুইয়েরই আশা, যৌবনের প্রথম দেখায় বুঝি তাদের লুক্কায়িত বাল্য প্রণয় ফুলে ফুলে মঞ্জরিত হ'য়ে উঠবে। তখন বিচার করবার সময় ছিল না। বিচার এলে দেখা গেল যে বৃক্ষ গজিয়ে ওঠবার সম্ভাবনা সে বিষবৃক্ষ। শতাব্দীর ভীত অথচ বলিষ্ঠ মন পরিমণ্ডল থেকে পলায়নের প্রয়াস ক'রেও পাচ্ছেনা। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যথার্থই বেদনা কাতর। আর শুভেশ, এই উড্ডয়ন প্রয়াসিনী বিহঙ্গিনীর পক্ষতাড়ন প্রয়াস উপভোগও কচ্ছে, বেদনাও পাচ্ছে অথচ উদাসীন। দৃঢ় মুষ্টিতে ধল্লেই সে কবলে টেনে নিতে পারে, কিন্তু সে যে বুলু। বুলু,—বুলুকে প্রথম দেখি শ্বশুর বাড়ীর নির্য্যাতন নিঃশব্দে সহ্য ক'ত্তে; চেয়ে আছে, যেন দেখ্ছে জীবনের পরিসমাপ্তি কি ভাবে তার হ'তে পারে। তখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু দৃষ্টি পথে পড়েনি। ঠিক্ তখনি পেল সে শুভদার স্পর্শ—তার সেই পুরাণো শুভদা। জীবন নতুন পথের সন্ধান পেল। কিন্তু সে কি পথ! লুণ্ঠিত মর্য্যাদা বহুনারী দেহকণ্টকিত বন্ধুর সে পথ। সে পথে একা সে চল্ল নারী মর্য্যাদার পতাকা বাহিনী। বিড়ম্বনা, সে পথের রত্নাকর তার শুভদা। অপরের সর্ব্বস্বাপহারী দস্যুকে নিজের সর্ব্বস্বদানের আকাঙ্খার মত প্রকৃতির পরিহাস আর নেই। সেই হ'ল শতাব্দীর ভাগ্যলিপি। কিন্তু সে টল্লনা, দৃঢ়পদে চল্ল। আত্মদানও কর্‌ল না, আত্মহত্যাও আর করল না। এ নাটক যে বিয়োগান্ত হবে তা একরকম অবধারিত। শতাব্দী বুঝেছিল, তাই তার ঠিক্ সময়ে পলায়ন। শুভেশের পূর্ব্বকৃত্য কর্ম্মফলই তাকে তার চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গেল। আর প্রকৃতির আর এক পরিহাস এই যে শুভেশ বুলুকে মৃত্যুমুখ থেকে জীবনমুখিনী করেছিল, সেই শুভেশই অজস্র জীবন সম্ভোগ আয়োজনের মধ্যেই মৃত্যুকে বেছে নিতে বাধ্য হ'ল। নাট্যকার এই দুটি চরিত্র অঙ্কনে গতানুগতিকতা বর্জ্জন ক'রে খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টির সাফল্য অনেক খানি নির্ভর করবে সুষ্ঠু অভিনয়ের উপর, কারণ, চরিত্র দুটি কঠিন। বুলু চরিত্রে অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন শ্রীমতী সরযূবালা। তাঁর পাশে দুর্গাদাসের শুভেশ এখনো পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে ওঠেনি। তাঁকে আমাদের অনুরোধ তিনি যেন পিডবলিউডির মিঃ সেনের মত এই ভূমিকাটি অবহেলায়মেরে দেবার মত মনে না করেন।

আর একটি চরিত্র নমিতা, শুভেশের কল্যাণে কুমারী জননী—প্রতিহিংসা পরায়ণা দলিতা ফণিনী; নিজের মৃত্যু দিয়ে মৃতকল্প শুভেশের শেষ সমাপ্তির হেতু। রক্তের ডাক নমিতায় প্রযোজ্য; কিন্তু এইত পার্শ্বের ব্যাপার। শ্রীমতী শেফালিকা এভূমিকায় বেশ ভাল অভিনয় করেছেন।

প্রাকৃত চরিত্রের মধ্যে মনোরঞ্জন বাবুর হরিয়া চাকর ও কৃষ্ণধন বাবুর গঞ্জিকা সেবী বুলুর বর, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকায় আশু বাবু, নীতীশ বাবু, শান্তি বাবু গোপাল বাবু, শ্রীমতী পদ্মা, শ্রীমতী হরিমতী, শ্রীমতী গিরিবালা প্রভৃতির অভিনয় মন্দ হয়নি। শ্রীমতী রেণুকা মার ভূমিকায় এখনও নবাগত ভাব কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। অবনীর চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, চরিত্রটি অসঙ্গতিতে পূর্ণ। জহর গাঙ্গুলী এই অসঙ্গতি পূর্ণ চরিত্রটিকে যেরূপ দিতে গিয়েছেন তাহা দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ

করতে পারে না। নাটকে কতকগুলি বিশ্রী ও কুরুচিপূর্ণ সংলাপ আছে এবং প্রধান চরিত্র দুইটি মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ। আশা করি কর্তৃপক্ষ এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করবেন এবং নাটকের অসঙ্গতি গুলিও সংশোধন করবেন।

মানসকুমার

চিত্র

মায়ের প্রাণ ও প্রতিশোধ

কুমারী অবস্থায় নীলা সন্তানের জননী হয়। সংসারের বাস্তবরূপ তাহার অপরিচিত নয়। সমাজ তার এই অপরাধ যে ক্ষমা করবেনা তা সে ভাল ভাবেই জানে। সুতরাং গৃহত্যাগ করে। ঘটনা ক্রমে সে ভিখারিনী লক্ষীর আশ্রয় পায় এবং সন্তানের মুখ চেয়ে ভিক্ষার পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু জীবনের বন্ধুর পথ-চলা সহজ-সাধ্য নয়—পদে পদে সহস্র বাধাবিপত্তি তার গতি রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। নীলার রূপও যৌবন তাহার সহজ পথ চলায় অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। সংসার দেবেনা তাঁকে বাঁচবার সুযোগ, সমাজ করবেনা তার সন্তানকে স্বীকার। সন্তানের মুখচেয়ে সে তাকে এক হোটেলের সামনে পরিত্যাগ করে যায়। শিক্ষিত যুবক সতীশ কুড়িয়ে পেলো এই শিশুটিকে এবং যত্নে মানুষ করতে লাগ্‌লো। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। চিত্র-পরিচালক সতীশ তার 'মাতৃস্নেহ' চিত্রের নায়িকা রূপে বিখ্যাত গায়িকা নীলা দেবীকে মনোনীত করে। পাশা পাশি কাজ করবার অবকাশে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা ভলোবাসায় পরিণত হয়। নীলার জীবনের কাহিনী শুনে সতীশ বুঝতে পারে যে তার কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি নীলারই পরিত্যক্ত সন্তান। সে নীলাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সমাজের রূঢ় বাস্তব রূপ নীলা জানে, জানে যে সমাজ কখনোই তাকে বধূরূপে, মাতারূপে স্বীকার করবে না। সে চলে যেতে চাইলো কাশী। ইতিমধ্যে স্টুডিয়োতে আগুন লাগে—নীলা তার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত কামনা, সমস্ত আকাঙ্খা দিয়ে গড়া ছবি রক্ষা করতে গিয়ে ভীষণ ভাবে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে। 'মায়ের প্রাণ' বাণী-চিত্রের গল্পাংশ মোটা মুটি এইরূপ। কাহিনীকার অজয় ভট্টাচার্য্য, পরিচালনা ও চিত্র গ্রহণ প্রমথেশ বড়ুয়া, সুরশিল্পী অনুপম ঘটক।

আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার কথা। পরিচালনায় ছোট খাট বহুত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁর বৈশিষ্ট্য তিনি বজায় রাখতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি চোখে পড়্‌ল যে বড়ুয়ার মত পরিচালকও এখন পর্য্যন্ত 'mass appeal'এর মোহ কাটাতে পারেননি। জানি, চিত্র পরিচালকের রুচির উপর সব সময় নির্ভর করা সম্ভব হয় না। ভোক্তার রুচি-অনুযায়ী রস পরিবেশন করতে গিয়ে এবং তার দাবী মিটাতে গিয়ে যা' হয়ে উঠতে পারত সুন্দর, তাই হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ। বাংলা কথা চিত্রের সব চেয়ে বড়ো ত্রুটি, আমাদের মনে হয়, যেখানে সেখানে 'নাকিসুরে' গান জুড়ে দেওয়া। একটি বেদনাতুর করুণ দৃষ্টি, নীরন্ধ্র নিস্তব্দতা যেখানে একটি গাম্ভীর্য্য পূর্ণ আব-

হাওয়া সৃষ্টি করতে পারত, সেখানে ইনিয়ে বিনিয়ে জ'লো কান্না-ভরা গানে তার সমস্ত effectই নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যে দৃশ্যে মাতালের অভিনয় করতে গিয়ে নীলা সতীশের কাছ থেকে আঘাত পেলো, সেখানে নীলার মুখে একটি 'করুণ রসাত্মক' গান জুড়ে দিয়ে পরিচালক সাধারণের তরল সেন্টিমেণ্টকে খুচিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। আমাদের মনে হয় ছবি খানির সমস্ত আভিজাত্য, dignity যেন এখানে শস্তা হয়ে গেছে। চিত্রখানি প্রথমাংশে শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার যে সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তা' পরিচালকের পূর্ব্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সত্যি বলতে কি, মনে হয় যেন এই অংশ টুকুই তার পরিচালনাধীনে তোলা হয়েছে বিশেষ করে চিত্রের আরম্ভটি।

আলোক চিত্রী ছিলেন পরিচালক মহাশয় নিজে। তিনি যে চিত্রজগতে একজন শ্রেষ্ঠ ক্যামেরা ম্যান, 'জিন্দগী'র পরে তা আর একবার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হোল। সঙ্গীত পরিচালক অনুপম ঘটকের সুর সংযোজনা প্রশংসনীয়। ভিখারিণী লক্ষ্মী ও নীলার গান এই চিত্রের একটি প্রধান সম্পদ এবং আকর্ষণ। আমরা আশা করি যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা ঘটক মহাশয়কে একজন শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী হিসাবে দেখতে পাব। আবহ সঙ্গীত মাঝে মাঝে এক ঘেয়ে হয়ে পড়েছে। কয়েকটি বিশেষ মামুলি ঘটনা ছাড়া (যা' আজ কালকার প্রায় সব বাংলা চিত্রেই চোখে পড়ে) কাহিনীর গতি সহজ, সরল এবং জমাট। গানের ভাষা এবং সংলাপ প্রসংশনীয়।

অভিনয়াংশে প্রথমেই উল্লেখ যোগ্য নায়কের ভূমিকায় পরিচালক বড়ুয়া ও নায়িকার ভূমিকায়, শ্রীমতী সরযূবালার অভিনয়। তাদের উভয়ের sincere অভিনয় দর্শকের মনে রেখা পাত করে। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন কারণ আমাদের মনে হয় সকল দিকে তার মত প্রতিভাবান শিল্পী আমাদের দেশে অল্পই আছে। তবুও আমাদের মনে হয়, অভিনয় তাঁর না করাই উচিত। সরযূ বালার অভিনয় শেষাংশের চাইতে প্রথমাংশে অধিক প্রাণবন্ত। ভিখারিণী লক্ষ্মীর সহজ, স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। মেয়েটার ভবিষ্যত খুবই উজ্জল। ইন্দু মুখার্জ্জি ও নির্ম্মল বন্দ্যো-র পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের অভিনয় সমগ্র চিত্র খানিকে হাস্য সরস করে রেখেছে। দর্শকের মন এদের অভিনয়ে একটা relief পায়। কিন্তু ইন্দু মুখার্জির রসিকতা জায়গায় জায়গায় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সতীশের মা-রূপে রাজলক্ষ্মীর অভিনয় মামুলি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা এবং সুশীল মজুমদারের পরিচালনা— আশা ক'রেছিলাম, 'প্রতিশোধ' আরো ভালো হবে। গল্প-রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র কতটা পটু তার প্রমাণ আপনারা ইতিপূর্বে সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছেন। কিন্তু এই 'প্রতিশোধ' গল্প চিরকেলে প্রথায় রচিত হ'লো কেন, কেন কোনো নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া গেলো না—আমাদের মনের প্রশ্ন এই। জমিদারের ছেলের প্রেম, মাঝখানে খানিকটা বোঝার ভুল, এই হ'লো গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। দু-তরফা কেউ কারো চিঠি যা'তে না পায়, তার জন্য যে উপায় কাহিনীকার ও পরিচালক অবলম্বন ক'রেছেন, আদৌ তার সুখ্যাতি করা চলে না। ও-ভাবে চিঠি ছিঁড়ে ফেললেই কি দু'জনকে দমানো বাস্তবিক ভাবে সম্ভব? কিন্তু আশ্চর্য, এই

ভাবে দু'জনের মনে নিদারুণ সন্দেহের সূত্রপাত হ'লো, যার পরিণামে জীবন ভ'রে উঠ্‌লো অশান্তিতে।

সুশীল মজুমদারের অন্যান্য বই-এর তুলনায় 'প্রতিশোধ' খুবই উৎরেছে—এ কথা সত্য। আরো ওৎরাতো যদি নায়ক প্রমোদকে বাতিল ক'রে দেওয়া হতো। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা স্বভাবগত চক্ষুলজ্জা নিয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ করা চলে না। জানিনা, এ-বইতে প্রমোদের মত অভিনেতাকে নামাবার কারণ কি। কিন্তু ছায়া দেবী তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে প্রমোদকে চাপা দিয়ে, বইএর আরো অনেক ত্রুটি ডুবিয়ে দিয়ে সমগ্রভাবে বইটিকে প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে তুলে এনেছেন। সুশীল মজুমদারের কৃতিত্ব এই-খানে যে তিনি ছায়া দেবীকে সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে তার ভেতরের অন্তঃ সলিল মাতৃস্নেহটুকু সবটাই বাইরে দর্শকের চোখের সামনে আন্‌তে পেরেছেন। ছায়া দেবী সত্যিই অপূর্ব অভিনয় ক'রেছেন। আর এক-জনের কথা বলা দরকার—তিনি রমলা। চটুল হাসি, চটুল চাহনি এবং চটুল কথা বলার ভঙ্গী দিয়ে তিনি দুঃখের অভিনয় দেখে নুয়ে পড়া দর্শকদের সোজা ক'রে তুলছিলেন। একে দিয়ে বইয়ের মাঝে relief আনা হ'য়েছে—এবং সে চেষ্টা বৃথা যায় নি। শীলা হালদারের নম্র ও বিনয়ী ভাবটা মন্দ লাগলোনা। জহর গাঙ্গুলীর গ্রাম্যযুবা-বেশটি সুন্দর হ'য়েছে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার : বাংলা ছায়াচিত্রে সঙ্গীতের মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। বিস্তর গান দিয়েও অনেক ছবি মার খেয়েছে—একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা যাকনা—একটা বইতে একটিও গান না দিয়ে কেমন ওৎরায়। কে সেই সাহসী পরিচালক, যিনি এই গুরুভারটি নিতে পেছ-পা নন্! সুশীল মজুমদার উঠ্‌তি ডিরেক্টার, তাঁর মধ্যে ক্ষমতার আভাষ আমরা পেয়েছি—তিনি কি গানহীন একটি ছবি তুলে নিছক পরিচালনা-কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন? রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি গান, কুমারী শৈলর নৃত্যভঙ্গীমা, তিমিরবরণের সুর সংযোজনা—এ-ই যদি হয় কোনো চিত্রের বিজ্ঞাপনের ভাষা, এরই ওপর যদি নির্ভর করে চিত্রের ভবিষ্যৎ,—তবে পরিচালকের প্রয়োজন কি, আমরাও তা'হলে চিত্র পরিচালনার কাজটা চালাতে পারি। গানে গানে কান ঝালা পালা হ'য়েছে—এবার চাই গানহীন চিত্র। হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়ে হয়ত নায়িকার নাক থেতলে গেলো, তিনি সেখান থেকেই pose দিয়ে গেয়ে উঠ্‌লেন—'জীবনে সব খোয়ালেম, পেলেম না প্রেম—এই জীবনে!' বলুন, তখন মনের অবস্থা কেমন হয়!

অমিয় ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকীয়

প্রকাশক ও লেখককে খুসি ক'রে গ্রন্থ-সমালোচনার যুগ এটা। কারো স্বার্থে আঘাত না দিয়ে নির্জলা মিথ্যা প্রচার ক'রে নিজের স্বার্থসিদ্ধির হুজুগ চারদিকেই দেখা যায়। যদি কোনো বই সত্যিই ভালো না লাগে, তবুও তাকে ভালো বলতে হবে—তা না হ'লে প্রকাশক ও লেখক খাপ্পা হবেন। এই ভাবে যদি সাহিত্য-বিচার চলে, তা'হলে তা'কে অবিচার বলাই শ্রেয়। যাঁরা যাঁরা বর্তমানে সমালোচনা-সাহিত্যকে সাহিত্যিক পেশা হিসেবে গ্রহণ ক'রেছেন—তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বার্থান্বেষী। সমালোচকের দায়িত্ব কম নয়, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টায় সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনেকটা নির্ভরশীল। তাঁরা যদি সাহিত্য নিয়ে এ-ভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসায় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে থাকেন—তার পরিণাম শুভ না হবারই কথা। নামকরা এবং পণ্ডিত ব'লে খ্যাত জনকয়েক সমালোচকের কাছ থেকেও এইরূপ কাজের নমুনা আমরা পেয়েছি;—এইটেই সবচেয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এ গেলো উচ্চস্তরের সমালোচনার কথা।

●

সংপ্রতি একটি নিম্নস্তরের সমালোচনা-প্রবন্ধ পড়ার পর হতাশ হ'য়ে প'ড়েছি। ঠিক বুঝতে পারিনে, এই সব অর্বাচীনদের রচনা সম্পাদকেরা ছাপেন কি ক'রে। যদিও যে-পত্রিকায় ছাপা হ'য়েছে, তার বক্তব্যের দাম কেউ দেয় না—এবং সে পত্রিকার যিনি সম্পাদক তিনিও প্রবন্ধকারের চেয়ে কম অর্বাচীন নন। কতকগুলি সাপ্তাহিক পত্রিকা ঘেঁটে জনকয়েক লেখকের নাম সংগ্রহ ক'রে তাদের একটা লম্বা ফিরিস্তি তৈরী করা হ'য়েছে—এবং বলা হ'য়েছে, এঁরাই বর্তমান সাহিত্যের কর্ণধার। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে কর্ণধারের কথা উঠেছিলো। জনকয়েক কর্ণধারের যে অতিরিক্ত চাহিদা উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধকারদের এবং তদনুরূপ লেখকদের জন্যে দেখা দিয়েছে—তার আভাসও দিয়ে ছিলাম। পুনরায় সেই কথা উল্লেখ করতে হলো। যদি বলি, সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যদুনাথ সরকার সমশ্রেণীর কবি, মেঘনাদ সাহা ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, কালিদাস নাগের চিত্রশিল্প নন্দলাল বসুর চিত্রশিল্পের তুলনায় কিঞ্চিৎ নিম্ন শ্রেণীর—তাহ'লে সেই তুলনা-মূলক সমালোচনার জন্যে

আপনারা নিশ্চয়ই বাহবা দেবেন। এইরূপ বাহবা পাবার জন্যেই উল্লিখিত অর্বাচীনেরা লেখনী ধারণ ক'রেছেন। ভদ্র ভাষায় শাসন করার মতো অভিধানে কথা নেই, অতএব অর্বাচীনের চেয়ে কোনো কঠিন কথা প্রয়োগ করা গেলো না। শুনেছি চাবুক নামক একটি পত্রিকা নাকি মফঃস্বলের কোন সহর থেকে বার হয়—সেই পত্রিকাটি অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে পারে বলে গুজব। এই সব লেখকদের শিক্ষার জন্যে চাবুক দরকার। যে-প্রবন্ধ নিয়ে এই প্রবন্ধ লিখছি তার নাম 'অতি-আধুনিক সাহিত্য'। যিনি প্রবন্ধটি লিখেছেন, তাঁকে আমরা একদিন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে আমন্ত্রণ করছি- এবং যে-সম্পাদক প্রবন্ধটি ছেপেছেন তাঁকেও আহ্বান করাই। তাঁদের কাছ থেকে আমাদের জানার অনেক কিছু আছে ব'লে আমাদের ধারণা। জ্ঞান বৃদ্ধির এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়ার ইচ্ছে আদপেই আমাদের নেই।

●

সাহিত্যকে নিয়ে যার যা খুসি বলতে পারে। কেননা, সাহিত্য বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করায় বিঘ্ন আছে—বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলে বিজ্ঞান নিয়ে কোনো কথা বলা যায় না। কিন্তু সাহিত্য জিনিষটা অত্যন্ত নিরীহ, তাকে নিয়ে যার যা খুসি বলায় বা করায় আপত্তি করার মতো ক্ষমতা এর নেই। এক কথায়, সাহিত্যের মস্ত দোষ এই-যে এর চক্ষুলজ্জা খুব বেশী। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ করার শক্তি এর নেই। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপামর জনসাধারণ সকলেই সাহিত্য নিয়ে থিয়োরী লিখতে আরম্ভ করেছেন। জানিনে, এর দৌড় কত দূর। কিন্তু যত দূরই থাকুক, দৌড় থামানোর ব্যবস্থা করা দরকার।

●

নানা জাতীয় সফরীর ফরফরানী দেখে দেখে আমরা অনেকটা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি। তবুও যখন নতুন ভাবে বা নতুন টেক্‌নিকে পুচ্ছ চালনা লক্ষ্য করি, তখন তা উপভোগ্যই মনে হয়। এই সফরীবৃন্দের ধারণা, তাঁরা রোহিত মৎস : তাঁদের নিয়ে এই প্রবন্ধ রচনায় তাঁদের সে-ধারণা আরো বদ্ধমূল হবে—আশা করি। আশা আমরা অনেকই ক'রে থাকি—নিরাশও আমরা সচরাচর হই। কিন্তু এই সব সাহিত্য-ধুরন্দরেরা আমাদের কোনোদিন হতাশ করেন নি। তাঁদের কাছ থেকে আমরা যখন যতটা চেয়েছি—মুক্তহস্তে তাঁরা তখনই তার চেয়েও অনেক বেশী আমাদের দিয়েছেন। এ জন্যে তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এবার তাঁদের কাছ থেকে নতুনতর সাহিত্যিক অবদানের আশায় ব'সে রইলাম।

এবার হয়ত শুনবো—হারাধন তর্করত্ন নামক উদীয়মান কথাশিল্পী সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের সাহিত্যিক সীমারেখা অতিক্রম ক'রেছেন। তার উত্তরে আমরা যদি বলি, তাঁর লেখা তো আমাদের আজো দৃষ্টিগোচর হয়নি! তার উত্তরও সহজ। পূর্বোক্ত প্রবন্ধকার বলতে পারেন—যদিও হারাধনের লেখা সাময়িক কোনো পত্রিকায় অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি—তবুও হলপ ক'রে এ-কথা বলা চলে-যে তাঁর মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, তার থেকেই অনুমান করা যায় যে তিনি আজো কলম না ধরলেও যদি তিনি কলম ধরেন, তাহ'লে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বিগত বা অনাগত কোনো শক্তি আমরা পাবো না। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধকারের শক্তি অসাধারণ: latent অবস্থায় যে-শক্তি থাকে, তারও খবর তিনি পান্। আমাদের প্রশ্ন, Potential না Kinetic, কোন্ energy নিয়ে আমরা কথা বলবো? একটা শোলার বলের মধ্যে potentical energy থাকতে পারে, লোহার এঞ্জিনের kinetic energyকে সেই জন্যে বাতিল করবো কি না!

নাচঘর

সুশীল রায়, সম্পাদক

গোপাল ভৌমিক, সহঃ-সম্পাদক

ধীরেন ঘোষ, পরিচালক

ত্রয়োদশ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৮ { ষষ্ঠ সংখ্যা

নিয়মাবলী

১। বর্ত্তমান সংখ্যা নাচঘরের ষষ্ঠ সংখ্যা;

২। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নাচঘর প্রকাশিত হয়;

৩। প্রতি সংখ্যার নগদ দাম চার আনা, বার্ষিক সডাক তিন টাকা চার আনা;

৪। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ এবং মৌলিক ও অনুবাদ গল্প উপন্যাস একাঙ্ক-নাটক কবিতা প্রভৃতি রচনা নাচঘরে সাগ্রহে গৃহীত হয়;

৫। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়;

৬। রচনাদি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

কার্য্যালয়ঃ

৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন: কলিকাতা ৩১৪৫

টেলিগ্রাম: রিদ্‌ম্‌স্‌ (Rhythms)

সূচীপত্র

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

দিবাবসানে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁশি যখন থামবে ঘরে
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার পরে
পড়বে যবনিকা,

সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ ;

সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাইবা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ ॥

আমি জানি মনে মনে,
সেঁউতি যূথী জবা
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।

বর্ষা শরৎ বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরী
বেজেছে উৎসবে,

সেথায় আমার আসন পরে
স্নিগ্ধ শ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখীর কলরবে ॥

আমি জানি এই বারতা
　　　　রইবে অরণ্যেতে—
ওদের সুরে কবির কথা
　　　　দিয়েছিলেম গেঁথে।

ফাগুন হাওয়ায় শ্রাবণ ধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে
　　　　উঠ্‌বে হঠাৎ বাজি;

কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বারতা উঠবে জেগে
　　　　রঙীন বেশে সাজি।
স্মরণ সভার আসন আমার
　　　　সোনায় দেবে মাজি॥

আমার স্মৃতি থাক্‌না গাঁথা
　　　　আমার গীতি মাঝে,
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
　　　　মর্ম্মরিয়া বাজে।

যেখানে ঐ শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
　　　　কিরণ-কণা-মালী;

যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের বেশে করে খেলা
যেথায় কাজের অবহেলা
　　　　নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
　　　　ভরে রূপের ডালি॥

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তে,—নানা সমাজে নানা ভাবেই তাঁর চিত্র-অবদান নিয়ে আলোচনা চলেছে গত কয়েক বৎসর থেকেই। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় সুধু নয় বোধ হয় প্রত্যেক উন্নত রাষ্ট্রে—তাদের ভাষায় সে সকল আলোচনা হয়েছে। তাঁর ছবি সম্বন্ধে সাধারণ এবং অসাধারণ রসিকেরা কে কি মত পোষণ করেন তা কবি জানতে চাইতেন, প্রত্যেকের দৃষ্টি ভঙ্গি উপভোগ করতেন। সুধু তাই নয়, প্রত্যেকের মন্তব্যটি সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন এবং তা করেও গেছেন।

তাঁর চিত্র আলোচনা বা সমালোচনা যাঁরাই করুন আমার মনে হয়, তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব কতকটা থাকা স্বাভাবিক ;—এখনও, তাঁর মহাপ্রস্থানের পর, তাঁর চিত্র সম্বন্ধে যদি কিছু লিখতে হয় তাও যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবশূন্য হবে তা মনে হয় না। বিশেষতঃ তাঁকে যারা দেখেছে, তাঁর সঙ্গে মিলেছে, তাঁকে ভালবেসেছে,—তাঁদের। কারণ তিনি এখনও জীবন্ত ভাবেই আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করচেন—এবং তা অনেক দিনই করবেন,—কালের প্রভাবে যতদিন না আমাদের মন থেকে প্রকৃতির নিয়মেই সে প্রভাব তিরোহিত হয়। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গতকাল 'পরিচয়' দেখতে গিয়েছি পূর্ণ থিয়েটারে। আসল বইখানি আরম্ভ হবার পূর্ব্বে,—রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করচেন, এই সবাক চিত্রটি দিয়েছে। তাঁর আশী বৎসর পূর্ণ হতে বিশ্বভারতীতে যে শেষ জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে, গত ২৫শে বৈশাখ—তখনকার এটা তাঁর নিজের মুখের বক্তৃতা, হাতে ছাপানো অভিভাষণটিও আছে। মঞ্চে তাঁর অপূর্ব্ব এই আবির্ভাব, দৃষ্টি মাত্রই বোধ হয় আমাদের সর্ব্বশরীরেই একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ এমন ভাবে ক্রিয়া করলে, তা প্রকাশের ভাষা নাই। এই আঘাত বড় তীব্র। তিনি যে আর নাই আমাদের মধ্যে,—বোধ হয় সবারই একথা মনে ছিল না। তার উপর কবি যখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করচেন,—যারা আমায় ভালবেসেচে তাদের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকবো ; তখন চক্ষের জল সংবরণ করা দায় হোলো। তাই বলছিলাম, তাঁর কথা নিয়ে যা কিছু আলোচনা এখন হবে,—তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবশূন্য হওয়া সম্ভব নয়।

চিত্রকলা অনুশীলন সূত্রে তাঁর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা তাঁর প্রথম থেকেই সুরু হয়েছিল যিনি তখন থেকে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতেই শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। আমরা এটা অনুমান করতে পারি, অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় পদ্ধতি একান্তভাবে গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনিও পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার অনুরাগী ছিলেন। তারপর বিশেষতঃ প্রবীণ বয়সে কবির ইউরোপ ভ্রমণ একবার নয়; তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার সময় থেকে যে কয়বার ঘটেচে, প্রত্যেকবারেই প্রত্যেক দেশের সকল প্রকার কলা বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ্য সুধু নয় বিশেষভাবেই উপভোগ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য সকল কলা প্রগতি তিনি বিশেষরূপেই লক্ষ্য, তাদের অন্তরতম ভাব উপভোগ করেছিলেন। তাদের মূল প্রেরণা সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন; তাঁর চিত্রগুলির মধ্যে তার পরিচয় আছে।

নাট্য কাব্য সাহিত্য ও সঙ্গীতকলার সঙ্গে তাঁর জীবন ধারার অবিচ্ছিন্ন গভীর যে সম্বন্ধ,—তা মুখ্য। তার তুলনায় তাঁর চিত্রকলা অনুশীলন যে গৌণ তা সহজেই বুঝা যায়। তাঁর জীবন-স্মৃতিতেই তিনি বলেছেন শিলাইদহতে থাকার সময়—কোন একটী আকার বা ড্রইং পেন্সিলের রেখায় সম্পূর্ণ হবার আগেই এক কাঁড়ি রবারের গুঁড়া জমা হয়ে উঠতো পাশে। অথচ আসল জিনিসটি ঠিক পেতনা তখনও। তখন সেদিকে নিরাশ হলেও তীক্ষ্ণ অনুভব এবং দৃষ্টি তাঁর ছিল, প্রকৃতির রাজ্যে সকল কিছু সৃষ্টির উপর।—চিত্র শিল্পের দিক থেকে যেটা সম্ভব হয় নি তখনকার দিনে; কিন্তু তাঁর সাহিত্যের মধ্যে বর্ষা বাদলের নানারূপ বৈচিত্র্য, নিসর্গের কত কত বর্ণনা তাঁব গদ্য পদ্যের ছত্রে ছত্রে অমৃত বর্ষণ করেচে, এমন নিসর্গ, প্রকৃতির সজীব বর্ণনা আর কোথায়?

তাঁর বিরাট ভ্রমণ উপলক্ষে,—পৃথিবীর নানা দেশের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের ঐশ্চর্য্যও তেমনি তার মধ্যে মানব শক্তির সকল কিছু সম্ভাবনার পরিণতি,—যথেষ্ঠ রস জুগিয়েছিল। তাঁর শিল্পিমন নিয়ে উরোপীয় চিত্রকলাক্ষেত্রে সকল বিভাগের পরিণতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। উরোপীয় রিয়ালিসম্ তাঁর বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্যের বিষয় ছিল, তাছাড়া আইডিয়ালিসম, ইম্‌প্রেসানিসম্ পোস্টইম্প্রেসনিসম বা ফিউচারিসম, এমন কি কিউবিসম্ পর্য্যন্ত সকল কিছুই তিনি এমনই গভীর ভাবে দেখেছিলেন এবং উপভোগ করেছিলেন,—হয়ত আমাদের দেশের অনেক শিল্পীর পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি।

একখানা ছবি আঁকতে একজন চিত্রশিল্পীর পিছনে, তার প্রকরণ, পদ্ধতি, তার উপাদান সংগ্রহের যে একটা শিক্ষা এবং তপস্যা থাকে, তাঁর সম্বন্ধে সেটী স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর সহজাত শিল্পিমন আর তীক্ষ্ণ সংস্কার লক্ষ্য প্রথম থেকেই শিল্পের সকল বিভাগেই অগ্রগতির তীব্র দৃষ্টি,—সহজ ভাবেই সে অভাব মোচন করেছিল। যে চিত্রকলার অনুশীলন তাঁদের

বাড়িতে চলেছিল সেদিকেও যেমন তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে জাপান, চীন, মলয়দ্বীপ জাভাদি, তারপর ঈরান,—ওদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জারমানী, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, রাশিয়া—তারপর পশ্চিম গোলার্দ্ধে এমেরিকায়—নিউইয়র্ক ভ্রমণ উপলক্ষে, সর্ব্বদেশে শিল্পকলার বৈশিষ্ট বিশেষ ভাবেই তাঁর কলা রস বোধ এবং বিকাশ শক্তির প্রচুর পুষ্টি সাধন করেছিল। মোটের উপর এতটা ভ্রমণ, তাঁকে যে অভিজ্ঞতা ও শিল্পকলা অনুভূতির অধিকারী করেছিল প্রকৃতির রাজ্যে তা অতি অল্প মানবেরই হয়ে থাকে।

জগতের চিত্রকলা প্রগতির সকল বিভাগেই তাঁর যে অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, এইটিই তাঁর শিল্প প্রকাশ পদ্ধতি নির্ব্বাচনের সহায়তা করেছিল। উরোপীয় রিয়্যালিসম, প্রাচ্য আইডিয়ালিসম, এবং তার ডেকরেটিভ থিম্‌এ সকল তখন গতানুগতিক হয়ে গেছে, কবি যখন তাঁর চিত্র স্থষ্টি আরম্ভ করেন। কবি কখনই গতানুগতিক পন্থায় চলতে পারেন না। তাঁর স্থষ্টি নিশ্চয়ই অসাধারণ পথেই যাবে। ভারতে পপুলার আর্ট তখন মাত্র দুটি, পূর্ণ উদ্যমেই তাদের কাজ চলছিল। একটি উরোপীয় রিয়ালিষ্টিক আর্ট অপরটি হ'ল ওরিয়েণ্টাল আর্ট তথা ইণ্ডিয়ান আর্ট; যা নূতন ভাবে সুরু করেছিল তার জয় যাত্রা। গতানুগতিক কোনও একটি বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ করে কিছু স্থষ্টি করা কবির উদ্দেশ্য নয়, পূর্ব্বেই আমরা তা লক্ষ্য করেছি, যদিও চিত্রশিল্প মাত্রেই তাঁর প্রাণের বস্তু আর সেই ক্ষেত্রে কিছু স্থষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনের সকল অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল।

ভারতে বোধ হয় ১৯২২ সালে গগনেন্দ্রনাথ কিউবিসম্‌ আরম্ভ করেন। এইটিই তাঁর মধ্যে একটা প্রেরণার কাজ করছিল। এখানে, এ কথাটিও জোর করে বলা দরকার যে, গগনেন্দ্রনাথের এই উদ্যম যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিল সে সাহস, ভারতের আর কোন শিল্পীর ছিল না। সে দিক দিয়ে গগনেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নেই এই ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে। গগনেন্দ্রনাথের কিউবিসম কতকটা উদ্দীপনা জুগিয়েছে আমাদের এখনকার চিত্রকলাক্ষেত্রে তা এখনও সাধারণের ভালমতে জানবার সুযোগ হয় নি। যাঁরা বাঙ্গলায় শিল্পকলার ইতিহাস লিখবেন তাঁরা এ সকল যথার্থরূপে শিক্ষিত সাধারণের গোচর করতে পারবেন, আর তখনই ঠিক জানা যাবে যে ভারতীয় শিল্পকলার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কলা-প্রগতি কতটা শক্তি জুগিয়েচে।

এখন যা বলছিলাম, আগেই বলেছি উরোপের শিল্প কলা প্রগতি যা কিছু বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন অথবা স্থষ্টি করেছে নব নব উদ্ভাবনায় আর পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে,—এ সকল শুধু লক্ষ্য নয় কবি প্রতিষ্ঠাবান কলা-রসিকদের সঙ্গে গভীর ভাবেই আলোচনা করেছেন,

আর সে আলোচনাও তাঁর বিশেষ উপভোগের বস্তু ছিল, তাঁর মুখ থেকে যাঁরা শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর এই ভাবের শিক্ষা আলোচনা কতটা সরস ছিল

যাই হোক, যখন তিনি আরম্ভ করলেন তিনি পশ্চাত্ত্য পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর চিত্রসমূহের মধ্যে পোস্ট ইম্প্রেসনিসম বা ফিউচারিসমের এতটা প্রভাব। তৈলের রং তিনি ব্যবহার করেন নি, বড় ল্যাঠা, খাটুনীও বেশী তিনি কালিকলম আর তার সঙ্গে সহজ পদ্ধতিতে পাতলা জলের রং দিয়েই ফুটিয়েছেন তাঁর ছবি। রংয়ের বাহুল্যতা তাঁর কোন কিছুতেই নেই, আছে কালীকলমের দ্বারা গঠিত মনমত কঠিন রেখাময় আকৃতিগুলি।

আমরা বিচারের জন্য তাঁর শিল্পে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির অনুসরণ বা প্রভাবের কথা বলেছি ঃ—কারণ কাজান, পিকাসো, পিসারে প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পীর কলা-পদ্ধতির সঙ্গে অভিব্যক্তিগত মিল আছে দেখা যায় বলে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে আরও একটু সূক্ষ্ম বিচারের অবকাশ আছে। কাব্য সাহিত্য এবং সঙ্গীতেও আমরা কবির গভীর প্রকৃতি-অনুগামী মনোবৃত্তির পরিচয় সর্ব্বত্রই পেয়েছি, সে দিক দিয়েও তাঁর চিত্র বিচার করলে যেটি প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয় সেটি এই যে, প্রাকৃত বস্তুতে তার বালক সুলভ সহজ দৃষ্টি ভঙ্গি। মানুষ প্রকৃতিকে প্রথমে কি চক্ষে দেখে, প্রথমেই তার অনুভব সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট বস্তু-তান্ত্রিক হয় কি? একটী মূর্ত্তি বা কোন বস্তুর আকার তার সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা নিয়ে কি প্রথমেই কারো চক্ষে আসে? আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা এলেও সকলেই কি সকল অঙ্গের সকল কিছু খুটিনাটি সংস্থান সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে থাকে? তা হয় না। কোন একটা বিশেষ অঙ্গ বা অংশই তার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয়। তার উপর যখন মিস্টিক মনের অন্তর্গত কল্পনা রাজ্যের ব্যাপার হয়, তখন তার একটা গুণগত ভাব লক্ষ্য করে তারই অভিব্যক্তি হয় চিত্রের বিষয়বস্তু। তাঁর কোন কোন ছবিতে সুধু আকার মাত্র নয়,—গতির অভিব্যক্তি যেমন সুস্পষ্ট তেমনই শক্তিমান। তাঁর হরিণ বা প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার প্রভৃতি যা রেখার ছন্দোবন্ধে প্রকট, তার সরল সহজ গতির তুলনা নেই।

এ যুগে ফটোগ্রাফের প্রাচুর্য্য, আবার তার সঙ্গে উরোপীয় বস্তু তান্ত্রিক শিল্পের প্রভাবানুরক্ত সাধারণ শিক্ষিত মানুষের চক্ষে আমাদের দেশে তাঁর চিত্র অবদান সেই কারণেই বিসদৃশ। যত লোক ছবি দেখে তার মধ্যে গুণগ্রাহী বা রসিক ক'জন? শিক্ষিত অভিমানী মন যাঁদের, যাঁরা হয়ত সাহিত্যিক বা পণ্ডিত তাঁদের অস্থির মন্তব্য আমাদের আলোচনার বিষয় নয়;—শিল্পী বলে যাঁদের অভিমান প্রবল, এমন কি প্রতিষ্ঠার অধিকারী যাঁরা তাঁদের মধ্যেও দেখছি নির্ব্বিবাদে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে বিচারহীন যে সব মন্তব্য বেরিয়েচে তা' তাঁদের মুখ থেকে বেরুনো উচিত ছিল না সুতরাং দুদিক দিয়েই কবির চিত্রকলার

বিচার কঠিন ;—প্রথমতঃ পশ্চাত্ত্য শিল্প-প্রগতির সকল ধারার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তাঁদের পক্ষেও যেমন আবার বিচারহীন মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে ; সহজ মানুষ মনের সঙ্গেও যাদের পরিচয় নেই তাদের পক্ষেও কবির ছবি উপভোগ করতে বিশেষ বাধা আছে ! চিত্রকলা বলতে কেবল মাত্র ফটোগ্রাফের আদর্শ যাদের মনের ক্রিয়া করচে তাঁদের সঙ্গে বিচার করা বৃথা। তাঁর মিষ্টিক মন চিত্র-কলার রহস্য স্মৃষ্টির দিকটা নিয়েই সার্থক হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন এই চিত্রকলার ক্ষেত্রে রিয়ালিসম আইডিয়ালিস্‌ম এদেশে আস্বাদ করা হয়ে গিয়েছে—সে ক্ষেত্রে কিছু করলেই প্রতিযোগিতার মধ্যে হয়ত গিয়ে পড়তে হবে। পদ্ধতি অথবা অভিব্যক্তির নৈপুণ্য তাঁর স্মৃষ্টির সঙ্গেই মেশানো। পদ্য এবং গদ্যসাহিত্যে এবং সঙ্গীতের রচনাতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, চিত্রকলায়ও তাকে তাই হতে হবে। তার সংস্কার তাঁকে ঠিক পথেই নিয়ে গিয়েছিল —তাঁর উপাদান এবং উপকরণের (টেকনিক) বৈচিত্র থেকেই তা পরিষ্কার বুঝা যায়— আর গগনেন্দ্রনাথের কিউবিসম্ যুগিয়েছিল তাঁর প্রথম সাহস।

মিষ্টিক মনের প্রেরণাই তাঁর চিত্রকলার আগাগোড়া সকল দিক্‌কার কথা। গগনেন্দ্রনাথের যে সাহসের কথা বলেচি কবির মধ্যে সেই সাহস অপূর্ব্ব ফল প্রসব করেচে। তাঁর ক্ষেত্রে তিনি একেশ্বর ; তাঁর নব নির্ব্বাচিত পদ্ধতি রসিক জনের প্রাণে সে গাঢ় অনুভূতি জাগাবে, প্রকৃতি রহস্যাগারের যে সন্ধান দেবে, তাঁর পূর্ব্বে কেউ তা কল্পনা করেনি। আমাদের দেশে কবির চিত্র বুঝাতে একজন লোকের দরকার,—কারণ এদেশে শিশু ও বালক মনের সহজ শিল্প প্রবৃত্তির কথা তার বাপ খুড়া, জেঠা, জানে না। ছবি কিছু একটা এঁকে আনন্দিত মনে সহজ বুদ্ধিতে তাঁদের দেখালে কানমলা খেতে হয় আর এই বুঝতে হয় যে পাঠ্যপুস্তক পড়া সকলের বড়, এ সব কাজ হেয়। বৃথা সময় নষ্ট করা হয় এসব কাজ করলে। কারণ এ কাজে অর্থ আমদানী হবে না। বালক মনের সহজ দৃষ্টি ভঙ্গি আর কবি বা শিল্পী মনের যে রং—এদেশের সাধারণের সঙ্গে তার পরিচয় নেই, যেহেতু শিক্ষার প্রসার নেই। কাজেই প্রকৃতির স্মৃষ্টি বৈচিত্র এখানে রস যোগায় না— কোন গতানুগতিক ধারায় এবং পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যদি কিছু না আসে। গোলা লোকে যদি কবির আঁকা ছবিকে ছবিতা বলে তাতে দুঃখ হয় না কিন্তু কলারসবোদ্ধা আর শিক্ষাভিমানী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গৌরবের অধিকারী কেউ যদি বলে যে,—ছেলেরা যে ছবি আঁকে তাই যদি একজন বৃদ্ধের হাত দিয়ে বেরোয় তাহলে তাকে কি বলা যায় ? এই সরল বিশ্বাসী বাবুকেও আমরা না হয় উপেক্ষার চক্ষে দেখলাম কিন্তু যদি এঁদের মধ্যে অপর একদল বলেন, কবি বৃদ্ধ বয়সে চিত্রকলাকে ব্যঙ্গ করেছেন ! তাঁদের—? সভ্যসমাজে স্বাধীন চিন্তা বা মনোভাব যদেচ্ছা প্রকাশে বাধা নেই ; একথা ত সকলেই জানেন।

মে ডে

পুলকেশ দে সরকার

একটি ছোট ঘর; দু'টি দে'য়াল আলমারীতে জিনিষ পত্র গোছানো; তক্তপোষে বিছানা পাতা; তাহারই উপর বসিয়া হৃদয় কি লিখিতেছিল। স্ত্রী বিজয়ার মাথাটা দেখা গেল ও শোনা গেল—

বিজয়া। বাজার যেতে ব'ল্ছি, শুন্‌ছ না?

হৃদয়। [ত্রস্তব্যস্ত হইয়া] এই যে চল্‌লাম; আজ রোব্‌বার কিনা—

বিজয়া। [আরও খানিকটা প্রবেশ করিয়া] রোববার ব'লে পেটের কাজটা তো বাদ নেই? সারা হপ্তাটা তো ছাইভস্ম আন, আজ একটু দেখে শুনে আন দেখি। ওদের বাড়ী কি সুন্দর সুন্দর তরকারী আনে, দেখ্‌লে চোখ জুড়োয় আর তেম্‌নি সস্তা—

হৃদয়। পরেরটা—

বিজয়া। [কথা কাড়ি] অমন দেখায়, কেমন? চোখের মাথা যে খেয়ে ব'সে আছে তাকে কে বোঝাবে? [সম্পূর্ণ প্রবেশ করিয়া] কিন্তু ওসব কি লিখ্‌ছ শুনি?

হৃদয়। [কাগজগুলি গুছাইতে গুছাইতে] ও কিছু না—

বিজয়া। কিছু না? তাহ'লেই হ'য়েছে, গান্ধী বরবাদ কর্‌ছ আর কি! তোমার তো লিখ্‌তে বস্‌লেই ওসব আসে। বিয়ে ক'রেছ এটুকু দায়িত্ববোধও কি তোমার নেই? বিয়ের আগে যা মানায়—

হৃদয়। বিজয়া! বিজয়া! বিশ্বমানব কল্যাণ অভিশপ্ত পৃথিবী—শান্তি চাই!

বিজয়া। বাঃ বাঃ, রঙ্গমঞ্চে নাম্‌লে না কেন? বিয়ে ক'রে একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ কেন?

হৃদয়। দাও, দাও পয়সা দাও, বাজারের থলিটা কই?

বিজয়া। [ক্যাসবাক্সটা খুলিতে খুলিতে] টাকা তো ফুরিয়ে এল—

হৃদয়। অ্যাঁ!

বিজয়া। আমি নিইনি গো, আমি নিইনি, তোমার সংসারেই সব খেয়েছে। আর অত অবিশ্বাস হ, টাকা পয়সা নিজে রাখলেই পার!

হৃদয়। একথা ওঠে কেন?

বিজয়া। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি তোমাকে চিনি না? আমি এক পয়সার তেলেভাজা পর্যন্ত খাইনে—

হৃদয়। তোমা বারণ করেছে কে? তবে ওসব তেলেভাজা-টাজা—

বিজয়া। ঐ এক শিখে রেখেছ—তেলেভাজা-টাজা বিষ, ওসব কেবল একট পয়সা না দেবার ছল। খেও—

হৃদয়। অন্য কিছু খেও—

বিজয়া। থাক্ থাক্ আর দরদ দেখাতে হবে না। তাও যদি তেমন স্ত্রী হ'ত। আমি ব'লে তাই—সকাল থেকে এক কাপ চা খাইনি এখনো—

হৃদয়। কি কি আন্‌তে হবে বাজার থেকে?

বিজয়া। আমার মাথা আর মুণ্ডু? ফাজ্‌লামী কর আমার সঙ্গে, না? একটা কথা বল্‌লে গায়েই লাগে না—[হৃদয় প্রস্থানোদ্যত] দেখেছ, দেখেছ? আচ্ছা বেশ, এই রইল তোমার ক্যাসবাক্স, মাত্র দেড়টি টাকা আছে আর ভারী তো মাইনে তার আবার— [হৃদয় প্রস্থান করিল

বিজয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল ; চশমার মধ্যদিয়া দুইটি জলন্ত চক্ষু জল্ জল্ করিতে লাগিল ; বিস্রস্ত বসন

নেপথ্যে। কোথায়—বিজয়াদি কোথায়?

বিজয়া। [ত্রস্তে উঠিয়া] আরে কে? সরোজ? এসো, এসো

সরোজ। আর আসা নয়, এবার চলি—

বিজয়া। সে কি! একটু চা করি—

সরোজ। না—না—সময় নেই, দিদি ওবেলা আপ্‌নাকে যেতে বলেছেন—

বিজয়া। যাব'খন, তুমি এবেলা ব'সো তো! জগা— [জগার প্রবেশ]

বিজয়া। [একটু আগাইয়া গিয়া জগাকে] যে জলটা বসিয়েছিলি না! ঐ দিয়ে এক কাপ চা কর্—শিগ্‌গির—লেগে থাকিস্ নে যেন— [জগার প্রস্থান]

সরোজ। না বিজয়াদি!

বিজয়া। চুপ! [সরোজকে টানিয়া বিছানার উপর বসাইতে বসাইতে] নাও, এখানে ব'সো তো—আমাদের সেই মায়াদির স্কুলের গল্প কর—ছেলেবেলাকার গল্প—

সরোজ। সত্যি, সেই চানাচুর কেড়ে কেড়ে খাওা—

সজা। আর মায়াদি তেম্‌নি বকতেন দেখ্‌তে পেলে—

বিজয়া। কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'তো—

সরোজ। [হাসিতে হাসিতে] একদিন হ'য়েছে কি, আমি তো এক পয়সার

চানাচুর কিনেছি! লিলি, ছায়া, শিবানী আমরা সবাই তো খাচ্ছি, অমনি মাস্নাদি—জেরা আরম্ভ হ'য়ে গেল, আমি ব'লে দিলাম লিলি কিনেছে, লিলি তো বেঞ্চের ওপর দাঁড়ালই, আমরাও দাঁড়ালাম, কিন্তু ওমা! লিলির কি কান্না!

সরোজ। লিলিদি কাঁদ্‌তেও পারতেন, বাপ!

বিজয়া। তারপর শোনো, আমার ভয়ানক কষ্ট হ'ল। লিলিকে বল্‌লাম, কিছু মনে করিস্‌নি ভাই, চট্‌ ক'রে ব'লে ফেলেছি। লিলি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্‌ল, আমি কি সে জন্য কাঁদ্‌ছি নাকি—খাবার জন্য লোকে বল্‌বে! [জগা চা দিয়া গেল] শুধু চা দিলাম, সরোজ—

সরোজ। তাতে কি, তাতে কি—

বিজয়া। তাতে আর কি, তুমি তো আর পর নও।

সরোজ। চা-টা তো বেশ হ'য়েছে—

বিজয়া। হ্যাঁ, ও চা-টা বেশ করে কিন্তু চাকর বাকরকে প্রশংসা ক'রতে নেই।

সরোজ। কেন?

বিজয়া। আস্কারা পায়।

সরোজ। [উঠিতে উঠিতে] চল্‌লাম, যাবেন কিন্তু ওবেলা।

বিজয়া। যাব নিশ্চয়ই যাব, তুমি একবার আস্‌তে পারবে না?

সরোজ। কেন, আপনারা দু'জন যাবেন, ওঁকে নিয়ে—

বিজয়া। আরে আমার কপাল, নেহাৎ তুমি না এলে জগাকে নিয়ে যাব, তুমি দিয়ে যাবে—

সরোজ। আচ্ছা, সে একটা হবেই। [সরোজের প্রস্থান, জগার প্রবেশ]

জগা। দিদিমণি!

বিজয়া। [তাক হইতে একটি বাঁধান বই লইতে লইতে] কী?

জগা। চিনি আনতে হবে।

বিজয়া। কী! এরই মধ্যে চিনি ফুরিয়ে গেল?

জগা। চায়ে চিনি লাগে—

বিজয়া। মুখে মুখে তর্ক করিস্‌ না, কী এমন চা হয়েছে যে অত চিনি এরই মধ্যে ফুরোবে? চা এক আমিই খাই, এবেলা এক কাপ, ওবেলা এক কাপ, কেউ এলে একআধ কাপ—

জগা। ফুরিয়ে তো গেল—

বিজয়া। মুঠো মুঠো মুখে পূরিস্‌ বুঝি?

জগা। বেশ, এবার থেকে আপনি চিনি দিবেন— [জগার প্রস্থান]

বিজয়া। [রুখিয়া উঠিয়া] দেবই তো, অত কথা কিসের রে ? [জগার পুনঃ প্রবেশ]

জগা। কথা আমারও ভাল লাগে না, রোজ রোজ সব কিছু নিয়ে খ্যাচ্ খ্যাচ্—

বিজয়া। ভাল লাগে না তো যা না, কে তোকে পায়ে ধরে থাক্‌তে বল্‌ছে ?

জগা। তাই দিন, আমার হিসাব মিটিয়ে দিন।

বিজয়া। তা' যাবিই তো, কোথায় যেন কাজ জুটেছে !

সবিতা। [প্রবেশ করিতে করিতে] কার—কার কাজ জুটেছে ? [জগার প্রস্থান

বিজয়া। দেখ্‌না এদের আক্কেল, এই সেদিন পাঁচ-পো চিনি আনা হ'ল, তা' দিন চারেক যেতে না যেতেই শেষ—

সবিতা। বলিস্ কি ?

বিজয়া। তবে আর বক্‌ছি আমার মাথা ? তাই ব'লে বাবুর রাগ হয়েছে, কাজ ছেড়ে যাবেন। যাক্ না, নিজে কি খাট্‌তে পারি না ? ভয় কিসের ? আর তা'ছাড়া ভাত ছড়ালে কাকের আবার অভাব ?

সবিতা। যাক্ না—যাক্ না—

বিজয়া। যাবে কি, যাব ব'ল্‌লেই অম্‌নি হুট্ ক'রে যাওয়া হ'ল—ইয়ার্কি নাকি ? আমার এই অসুস্থ শরীর—

সবিতা। তোর অসুখ নাকি ?

বিজয়া। অসুখ না তো কি ? আমি পারি নাকি এই সমস্ত সংসারের ঝঞ্ঝাট পোয়াতে—কর্তাটি তো দাঁত দিয়ে কুটোটি নাড়বেন না—

সবিতা। বলিস্ কি, অমন সুন্দর মানুষ—

বিজয়া। যা যা, ঘর তো করতে হয় না, সুন্দর কেবল বাইরেটাই, যে ক'রে আমি—

সবিতা। আমরা সব্বাই বলাবলি করি বিজয়া—ওরা কত সুখী !—

বিজয়া। সুখী না তো কি ? তোরা এসব বেয়াড়া আলাপ করিস্ কেন ?

সবিতা। বেয়াড়া আবার কি ? ভালবেসে—

বিজয়া। দেখ্ সবিতা, বিয়ের আগে অনেক কথাই মানায়—কিন্তু কারও দাম্পত্য জীবন নিয়ে তোরা কুমারী অবস্থায়—

সবিতা। বিজয়া, তুই সত্যিই হাসালি—তুই কী রে ! [হৃদয় প্রবেশ করিল

হৃদয়। আরে, নমস্কার নমস্কার ! কখন এলেন ?

সবিতা। এই তো এলাম, ভারী সংসারী হ'য়েছেন দেখ্‌ছি।

বিজয়া। বাজার এনে কোথায় রাখ্‌লে, দেখি কি ছাইভস্ম এনেছ, তুই বোস সবিতা। [প্রস্থান

সবিতা। চল্‌না, আমিও দেখি হৃদয়বাবু কেমন বাজার করেন। [প্রস্থান

হৃদয়। [জামা রাখিতে রাখিতে] জগা!

নেপথ্যে বিজয়া। জগাকে আবার কেন?

হৃদয়। একটু দরকার আছে।

নেপথ্যে বিজয়া। যা তো দেখি, কী আবার দরকার পড়ল! [জগার প্রবেশ]

হৃদয়। চা করেছিস্?

জগা। না তো!

হৃদয়। বাঃ বেশ, ঐযে উনি এসেছেন, ওঁকে চা দিস্‌নি?

জগা। না, চিনি নেই, তা'ছাড়া দিদিমণি বলেন নি কিছু—

হৃদয়। বল্‌বেন আবার কি, বোকা! চিনি নেই তো চিনি নিয়ে আয়।

জগা। দিন পয়সা।

হৃদয়। তোর দিদিমণির কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আয়। [জগার প্রস্থান, বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া। কি, ব্যাপার কি, তোমার যে সবটাতেই বাড়াবাড়ি!

হৃদয়। মানে?

বিজয়া। সবিতা আমার বন্ধু, তোমার এত—

হৃদয়। বাঃ, এসেছেন!

বিজয়া। এসেছেন—সে আমি বুঝ্‌ব। ও কোন্ জায়গায় না যায় শুনি?

হৃদয়। আস্তে—তোমারই তো বন্ধু—

বিজয়া। বন্ধু ব'লে আমরা ওরকম নই—জগাটা আবার গেল কোথায়, এই জগা! [জগার প্রবেশ] নে চিনি নিয়ে আয় একপো, আজই যেন সবটা গুলে খেও না—[জগা প্রস্থানোদ্যত]

হৃদয়। আর কিছু আনতে দেবে না?

নেপথ্যে সবিতা। কিছু আন্‌তে দিস্‌না যেন বিজয়া, আমি এইমাত্র-[সবিতার প্রবেশ] চা খেয়ে এলাম।

বিজয়া। আহা, তোর ন্যাকামিতে মরে যাই, তোর আবার খেতে লজ্জা করে রে! [জগাকে] ভাল কেক্ আনিস্ আর সেদিনকার মতো আধপোড়া অম্‌লেট আনিস্‌না

যেন, বুঝলি ? [জগার প্রস্থান] সবিতা, বোস্ তুই, সকাল থেকে একটু গড়াতে পারিনি, গা-টা এম্নি ম্যাজ্ ম্যাজ্—

সবিতা। চল্না, আমিও তোকে সাহায্য করব—

হৃদয়। জগাই আসুক না, কুট্নো—

বিজয়া। [জ্বলিয়া উঠিয়া] হ্যাঁ কুট্নো জগাই কাটে কিনা রোজ ? আর তোরই বা হ'ল কি আজ বল্তো সবিতা, অমন আল্গা লজ্জা আমি দেখ্তে পারি না।

সবিতা। লজ্জা কিরে ?

হৃদয়। ঐ তো জগা এল, চা-টা শিগ্গির কর্ জগা—

বিজয়া। তোর বুঝি আর কমলেশবাবুর কথা মনে নেই ?

সবিতা। যাঃ, তুই কীরে—

বিজয়া। যা বল্লেই হ'ল, কমলেশবাবুর যত কবিতা সব সবিতাকে নিয়ে, আমার তো স্পষ্ট মনে আছে—

মরমি ! শোণিতের মসী দিয়ে কি লিখিস্ কবিতা
আঁধার কাটিয়া জাগে পূবাকাশে সবিতা
বীজাণু কি জীবাণু দীপালির পলিতা
জীবনের গোমুখী সবই তা সবই তা !

হৃদয়। [হাসিতে হাসিতে] বাঃ বেশ কবিতা তো-!

সবিতা। এ স-ব ওদের বানানো, জানেন ?

বিজয়া। কমলেশবাবু তোকে কবিতা লিখে দেয় নি ? কিন্তু আমি ভাবি অমন একটা কুৎসিত, আবার তাও বিয়ে করেছেন, গাল ভাঙা—

হৃদয়। জগাটা কর্ছে কি ?

বিজয়া। আন্ছে আন্ছে, সব ক'রে কম্মে আন্বে তো ?

হৃদয়। ততক্ষণ অন্ততঃ—

বিজয়া। দেখ্ছি আমি, আমায় যেতে বল্ছ তো ? [দ্রুত প্রস্থান

ঘরে কিঞ্চিৎ স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। হৃদয় ও সবিতা কেহ কাহারও দিকে তাকাইতে পারিল না। পরক্ষণেই একটা প্লেটে খাবার লইয়া বিজয়া প্রবেশ করিল এবং সবিতার সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, খেতে থাক্ চা-টা আস্ছে।

সবিতা। তোর মীরা ভাদুড়ীর কথা মনে পড়ে বিজয়া ?

বিজয়া। দেখ্তে পারিনা ওটাকে।

সবিতা। সিনেমায় যোগ দিয়েছে আজকাল।

বিজয়া। নাকি ? জানি, ওটা ঐ রকমই হবে।

সবিতা। শুনতে পাই এক মুসলমানকে বিয়েও করেছে।

বিজয়া। বাঃ বাঃ একেবারে পূর্ণাহুতি—

হৃদয়। রিভলিউসানারী বল—কিন্তু আপনি তো ওতে হাত দিচ্ছেন না।

সবিতা। আমি একা !

বিজয়া। আবার দোকা কোথায় পাবি, ন্যাকা কোথাকার, খা না। এবার তুইও মীরার পথ ধর্।

সবিতা। যাঃ, তুই একটু খা না ভাই বিজয়া।

বিজয়া। আমি ওসব খাইনা। [জগার চা সহ প্রবেশ] নে চা এল, খা। স্কুলের নাম ডোবাল মীরাটা।

সবিতা। কেন, আমাদের দু'ক্লাশ ওপরে পড়্‌ত চপলাদি, তিনিও তো—[কেক্ ভাঙ্গিল]

বিজয়া। যাঃ. কার সঙ্গে কার তুলনা ! চপলাদি নাচ্‌তেন, থিয়েটার সিনেমায় তো যান নি আর তাও আজকাল ছেড়ে দিয়েছেন।

সবিতা। বিয়ে হ'য়েছে যে !

বিজয়া। আহা, তা' হলই বা, চপলা দিই ছেড়ে দিয়েছেন, চপলাদি যদি নাচ্‌তে চাইতেন ওর বর বুঝি বারণ ক'র্‌তে পারত ? নাচ দেখেই তো বিয়ে ! বর দু'শো টাকা মাইনে পায়, জানিস ? বালীগঞ্জে বাড়ী আছে, মোটরও আছে শুনি।

হৃদয়। কি কাজ করে ?

সবিতা। পুলিশে। [মুখের কাপটা নামাইয়া বলিল] আজ চলি ভাই বিজয়া, মা আবার বক্‌বেন। [উঠিল]

বিজয়া। আহা মা'র কত ভয় তোর ? [উঠিল]

সবিতা। না ভাই, ভয় বৈ কি ? একদিন যাস্ না আমাদের বাড়ী, যাবেন একদিন হৃদয়বাবু বিজয়াকে নিয়ে—

বিজয়া। হ্যাঁ হয়েছে, চল্ ! [উভয়ের প্রস্থান]

হৃদয় আবার খাতা কলম লইয়া বসিতেছিল এমন সময় বিজয়ার পুনঃ প্রবেশ

বিজয়া। গেল তো কতগুলো পয়সা ?

হৃদয়। কিসের ?

বিজয়া। তোমার অতিথি বিদায়ে—ন্যাকামি কর কেন? আমি আর হিসেব টিসেব রাখতে পারব না বাপু। এই ক'রে ক'রে পয়সা যাবে আর শেষটায় 'হ্যাঁ, এত খরচ হ'ল?' হ্যান্ হ'ল? ত্যান্ হ'ল? কি? কথাটা যে কাণেই তুল্‌ছ না? [বলিয়া হৃদয়ের খাতাটায় টান দিল; হৃদয় তাকাইল]

হৃদয়। কেউ এলে—

বিজয়া। কেউ এলে? সব্বার বেলায় তো অমন হয় না? আমি নিজে আমার লোকজন এলে এক কাপ চা দিতে পর্যন্ত সঙ্কোচ পাই—

হৃদয়। আমি তো মানা করিনি।

বিজয়া। মানা ক'রবার ধরণ কি একটাই? যাই হোক্, সবিতার গায়ে পড়ে আসা-যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না। তা'ছাড়া তোমার অসুখের অজুহাতে, আমি যখন দেশে একলা বাড়ীতে—থাক্‌না সঙ্গে চাকর, সবিতার একলা আসা নিয়ে ঢের কথা হ'য়ে গেছে, সে আমি সইতে পারি না। এতে তুমি রাগই কর আর যাই-ই কর।

হৃদয়। রাগ করার পথ নেই। বিয়ে যখন হ'য়েছে মিথ্যে সন্দেহও সইতে হবে। কিন্তু অসুখের যারা খোঁজ নিতে পার্‌ল না তারাই সমালোচনায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠল।

বিজয়া। হবে না, একলা বাড়ীতে অমন—

হৃদ। বাড়ী আমার নয়, ভাড়াটে বাড়ী, প্রচুর লোক—

বিজয়া। মনটা কি ভীড় বুঝে চলে, না, ভয় পায়?

হৃদয়। ইস্ কী ছোট মন তোমার?

বিজয়া। আর কী আমার বড় মন রে - পুরুষের মন!

[নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দ]

বিজয়া। [উঁকি মারিয়া দেখিয়া] তোমার সেই কম্‌রেডটি, ঠিক আঁচ ক'রেছি, অসময়ে এসে আমাদের না জ্বালালে আবার কম্যুনিজ্‌ম্! [বিজয়ার প্রস্থান]

হৃদয়। [উঠিয়া ও আগাইয়া গিয়া] এস যোগেন।

যোগেন। [প্রবেশ করিতে করিতে] বেশ সংসারটি গুছিয়ে নিয়েছেন তো? কিন্তু যতই করুন প্যাট্রিয়ার্কাল ফ্যামিলির যে ডিস্‌ইন্টিগ্রেশন সুরু হ'য়েছে তা ঠেকাবেন কি করে?

হৃদয়। কম্‌রেড, যতদিন এই হওয়ার বেদনা চল্‌তে থাক্‌বে ততদিন একে নেই ব'লেও তো উড়িয়ে দে'য়া চল্‌বে না। পুঁজিবাদের অবসান না হ'লেও এ সম্পূর্ণ হবে না তো।

যোগেন। তাহ'লে প্রফেসানাল রিভলিউসানারীদের কি হবে?

হৃদয়। সর্বহারার বিপ্লব কি কারও অপেক্ষা রাখে? নেতৃত্বও এদের মধ্যে ক্রমশ গজিয়ে ওঠে।

যোগেন। কিন্তু নেতৃত্ব কি ফাঁকা জিনিষ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করেই না নেতৃত্ব?

হৃদয়। ব্যক্তি কিন্তু ব্যক্তিত্ব নয়—ব্যক্তিত্ব পূজা বুর্জ্জোয়াদের শেষ ভরসাস্থল।

যোগেন। তাই'লে লেনিন আর লেনিনের কবরের কি ব্যাখ্যা হবে?

হৃদয়। আমাদের সংস্কার যুগের সীমানার সঙ্গে খাপ খায় না, অতিক্রম ক'রে যায়। বিপ্লবের সাহায্যে উৎপাদিকা শক্তিটাই মুক্তি পায় এবং নূতন উৎপাদন সম্পৃক্ত গড়ে উঠতে থাকে, এরই ওপর নব রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপর অতিরিক্ত চাপ দিলে ফ্যাসীবাদে পৌঁছাতে আমাদের দেরী হবে না অর্থাৎ যাকে বলে এক-নেতৃত্ববাদ। আমরা চাই সর্বহারার নেতৃত্ব, সর্বহারা একটা শ্রেণী। প্রয়োজন হচ্ছে সমষ্টিগত মন, সর্বহারার অন্তর্বোধ, এর বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

যোগেন। কিন্তু সে কি এই সংসার ক'রে? পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা বইয়ে দেয়।

হৃদয়। আমি স্বীকার করি যোগেন যে কম্যুনিজম্-এ তত্বকথার চাইতে কাজটাই বেশী। সেদিক্ থেকে আমি প্রতিক্রিয়াশীল হ'য়ে গেছি। কাজ ছাড়া প্রফেসরি চলে কম্যুনিজম্ চলে না।

যোগেন। তাই ব'লে প্রতিক্রিয়াশীল?

হৃদয়। একেবারে নির্জলা। শ্রেণীদ্বন্দ্বে নিরপেক্ষতা ব'লে কোন জিনিষ নেই। একপক্ষে তোমাকে থাক্‌তেই হবে নিষ্ক্রিয়তার কোন মানে এখানে নেই। আমি নিজে এখন আমার আপন মরাবাচা নিয়ে ব্যস্ত, সমষ্টিতে তো নেই।

যোগেন। সংসারে তা' না ক'রেই বা উপায় কি?

হৃদয়। দেখ যোগেন, এই অজুহাতে আত্মবঞ্চনা ক'রে কিছু লাভ হবে?

যোগেন। তা' সত্যি, আপনি যে কাজের পথ থেকে স'রে পড়্‌বেন এ আমরা অনেকেই ভাবিনি। আপ্‌নার শত্রুরা খুশী হ'য়েছে।

হৃদয়। প্রশংসার কথা নয়। এমন হ'তে পারে যে মার্ক্সীয় সাহিত্য আমাকে কেবল সাহিত্য রূপেই আকৃষ্ট করেছিল। যাদের তুমি শত্রু বল্‌ছ তাদের থেকে আমার অহংই আমাকে পৃথক্ করেছে।

যোগেন। একটু একটু টাচ-এ থাকুন না।

হৃদয়। না যোগেন, কাজ না ক'রতে পারলে কেবল টাচ্-এ থাক্‌লে অহঙ্কারের মাত্রাই বাড়িতে তুলবে।

যোগেন। তা'হলে আপ্‌নাকে আমরা হারালাম ?

হৃদয়। একেবারে। যোগেন, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া যে মানুষের কত বড় আঘাত এ অভিজ্ঞতা যেন তোমার না হয়।

[চা সহ জগার প্রবেশ]

যোগেন। টি সেস্ কমিটী বুঝি ? ওরা আবার ছবি দেয়, মা শিশুকে চা খাওয়াচ্ছে, ওপরে লিখেছে, গোড়া পত্তন ভালই হ'চ্ছে। বাঙ্গালার আগামী রাজনীতিরই কেবল গোড়া পত্তন হ'লনা।

হৃদয়। যোগেন, আমি অদৃষ্টবাদী নই, There are forces at work, আমার দৃঢ়বিশ্বাস বাঙলার আন্দোলন সব চাইতে তীব্রতম হবে। প্রথমতঃ, এদেশে ভদ্রলোক ব'লে এক সম্প্রদায় আছে, যেটার সংখ্যা ও প্রাবল্য অন্যদেশে কম। দ্বিতীয়তঃ, অবাঙ্গালীদের অর্থ এখানে বিদেশী পুঁজিবাদের কাজ করছে। তৃতীয়তঃ এখানকার জমিদারী প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রাদাদের হাতে। চতুর্থত, চাষীরা প্রধানতঃ মুসলমান। সহর মজুরেরা অধিকাংশ অবাঙ্গালী। হিন্দুদের আর্থিক অগ্রগতির জন্য, মুসলমানেরা কেবল চাক্‌রীর বাতিরেই হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অপ্রীতি ওস্কাবে। এর ফলে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রাদেশিক স্বার্থসংখাত থাক্‌লেও বৃহৎ স্বার্থের নামে বাঙ্গালী হিন্দু জমিদার মহাজন অবাঙ্গালী পুঁজিবাদির হাত মিলোবে। কেবল তাই নয়, হয়তো আশ্চর্য শোনাবে, এরাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অপ্রীতি ওস্কাবে।

যোগেন। কেন, আত্মরক্ষার জন্য ?

হৃদয়। আত্মরক্ষাই বটে ! জমিদারেরা চাষী আন্দোলন চায় না, কেন না চাষী আন্দোলনের পরিণতি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ; তাই যতদিন হিন্দুমুসলমান কৃষক গৃহদ্বন্দ্ব ক'রবে ততদিন চাষী আন্দোলন অর্থনৈতিক খাতে বইবে না। শুনলে আশ্চর্য হবে কি, যদি বলি হিন্দুমহাসভা আর মুস্‌লিম লীগে মহামিলন সজ্ঘটিত হবে।

যোগেন। কি যে বলেন !

হৃদয়। মৈমনসিং থেকে বড়বাজার অবধি টেলিফোনের যোগসূত্র স্থাপিত হবে।

[জগার প্রবেশ

জগা। কলের জল চ'লে যাচ্ছে। দিদিমণি বল্‌ছেন, চানের বেলা হ'ল—

যোগেন। ও তাইতো, আমরাই না হয় লক্ষ্মীছাড়া [উঠিতে উঠিতে] আপ্‌নার যে—তা' আজ্‌কে যাচ্ছেন তো ?

হৃদয়। কোথায় ?

যোগেন। সে কি ! এতই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছেন ? আজ যে মে ডে !

হৃদয়। মে ডে ! জান যোগেন, এই দিনটাতেই আমি গ্রেপ্তার হ'য়েছিলাম। তবু আজ মে ডে করার যোগ্যতা আমার নেই।

যোগেন। কেন ?

হৃদয়। সাহিত্যসভায় আজ আমার প্রবন্ধ পড়ার কথা—

যোগেন। শেষটায় সাহিত্য—

হৃদয়। আদর্শ বিচ্যুত মানুষের আর কি বিলাস বল ? সাহিত মারফৎ আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাই কিন্তু সে কেবলই সান্ত্বনা, মিথ্যা পুতুল নেড়ে পুত্রশোক নিবারণ করা। আজ এস যোগেন। (হৃদয় ঘুরিয়া দাঁড়'ইল, যোগেন্ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল) [বেগে বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া। এসব কি ?

হৃদয়। কী সব ?

বিজয়া। এসব কর্‌তে না পারলে যদি জীবন ব্যর্থ মনে করো তবে বিয়ে করলে কেন ?

হৃদয়। আজ বুঝ্‌ছি সেটা ভুল হয়েছে।

বিজয়া। একটা মেয়ের সর্বনাশের পর ?

হৃদয়। নিজের প্রয়োজনকে মেটাবার ভিন্ন পথ ছিল, সাহস ছিল না। আর—

বিজয়া। আর ?

হৃদয়। মনে করেছিলাম—

বিজয়া। এসব আমি বরদাস্ত ক'র্‌ব ?

হৃদয়। অন্যায় কাজ যখন নয় তখন তুমি ত আমার সাথী হবে।

বিজয়া। আজ মনে হ'চ্ছে ?

হৃদয়। আজ মনে হ'চ্ছে, বিয়ে ক'রলে মানুষের স্বীয় আদর্শ সত্তা সব কিছুই বিসর্জন দিতে হয়, মানুষের দেহটাই হ'য়ে ওঠে বড়—

বিজয়া। বাহবা—বাহবা—

হৃদয়। নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর তুমি বিজয়া, তোমার প্রয়োজনই আজ উদগ্র হ'য়ে উঠবে—হবে সত্য।

বিজয়া। হুঁ, এখন চান ক'রতে যাও তো— [বিজয়ার প্রস্থান, হৃদয় ক্লান্তভাবে দে'য়ালে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

দৃশ্যান্তর

সেই ঘর ; বিজয়া একখানা পত্র পড়িতে পড়িতে প্রবেশ করিতেছে ; হৃদয় শুইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে]

হৃদয়। কার চিঠি ?

বিজয়া জবাব না দিয়া পড়িতেই লাগিল ; চিঠির এই পিঠটা শেষ হইয়া গেলে অপর দিক্‌টা পড়িল ও পরে হৃদয়ের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

হৃদয়। [চিঠিখানা তুলিয়া লইতে লইতে] ও, বনগ্রামের ? [খানিকটা পড়িয়া লইয়া]···বিবাহ করিয়া অবশ্যই যে যার কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রীসহ বসবাস করিবে, ইহাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারে না, থাকিলেও আজ ইহা জোর করিয়া বলিবার সাধ্য নাই ; তবে অজয়ের বিরাট সংসার, আমি বাতে পঙ্গু ও বড় বৌমা হার্টের রোগে দুর্ব্বল, এমতাবস্থায়···

বিজয়া এতক্ষণ দেওয়াল আলমারীর দিকে পিছন ফিরিয়া হৃদয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। এইবার অকস্মাৎ বাধা দিয়া বলিল।

বিজয়া। চিঠিটা জোরে পড়ার মানে ?

হৃদয়। বেশ, তবে মনে মনেই বাকীটা পড়ে নি।

বিজয়া। ওসব হবে না, পরের সংসারে দাসী বাঁদী হ'য়ে আমি কাটাতে পারব না।

হৃদয়। পরের সংসার ?

বিজয়া। আমার তো নয় ? আমার পৃথক সাধ আছে, আহ্লাদ আছে—

হৃদয়। সে কি একান্নবর্ত্তী পরিবারে থেকে হয় না ?

বিজয়া। না—ইস্‌—কেন ?

হৃদয়। অথচ, আজ যদি আমার চাক্‌রি যায় ?

বিজয়া। অলুক্ষণে কথা তো খুব ডাক্‌তে পার ?

হৃদয়। সে দুর্দিনে আমাকে সেই সংসারেই আশ্রয় নিতে হবে।

বিজয়া। আমি যাব না।

হৃদয়। কোথায় যাবে ?

বিজয়া। যেদিকে দু'চোখ যায়। আর তাই বা কেন, যেখানে সেখানে ফেলে রাখার জন্য বিয়ে করেছিলে ?

হৃদয়। যেখানে সেখানে ? সে যে আমার জন্মস্থান, বিজয়া।

বিজয়া। কেবল তোমার তোমার—আমার কিছু নেই? আমার তো—নেপথ্যে কেহ ডাকিল] মামা!

হৃদয়। [দরজা খুলিয়া] কে রে? আয়? আয়—আয় - [পিছন ফিরিয়া বলিল] বিভা আর আভা এসেছে। [বিজয়া মুখ বিকৃত করিল ও বিভা ও আভা প্রবেশ করিল।]

বিভা। কি বিরাট প্রসেশন মামা!

হৃদয়। প্রসেশন?

বিভা। ম—স্ত! নাঁরে আভা?

আভা। আমি তো ভাবলাম মামাকে পাওয়াই যাবে না।

হৃদয়। কেন—কেন?

বিভা ও আভা একসঙ্গে। বাঃ, আজকে যে মে ডে!

হৃদয়। ওঃ!

বিভা। মামা যেন আর জানেন না!

আভা। যাবেন না মামা?

হৃদয়। কোথায়?

বিভা। ময়দানে যে মস্ত র‍্যালি। লাল ঝাণ্ডে কী—হি হি হি [হাসিতে লাগিল

হৃদয়। তার চাইতে একটা গান গা বিভা, শুনি!

আভা। বাঃ, আমাদের যে দেরী হ'য়ে যাবে!

হৃদয়। হবে না, ঢের বাকী এখনো, আমিও তো বেরোবো।

বিভা। আমাদের সঙ্গে তো?

হৃদয়। না, একা, সাহিত্যসভায়।

আভা। বাঃ, আমরা এলাম, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে যে!

বিভা। [সুর করিয়া] যেতেই হবে রে-এ-এ

বিজয়া। সরোজদের বাড়ীর এনগেজমেণ্ট, তৈরী হ'য়ে নাও।

হৃদয়। সাহিত্য সভা?

বিভা ও আভা। মে ডে?

হৃদয়। মে ডে! মে ডে!

বিজয়া। আরতির বিশেষ অনুরোধ, সরোজকে কথা দিয়েছি—

বিভা। মামা, লাল ঝাণ্ডে কী, তবে আমরাই যাই—

বিজয়া। প্রস্তুত হ'য়ে নাও।

হৃদয়। প্রস্তুত ? বিজয়া, এম্‌নি একটা মে-ডেতে আমি অপ্রস্তুত ছিলাম—

বিজয়া। কিন্তু গ্রেপ্তার হয়েছিলে। তাইতেই তো আজ সরোজদের বাড়ীর এন্‌গেজমেণ্ট !

হৃদয়। কিন্তু সাহিত্যসভা ?

বিভা। আর মে ডে ?

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে - হৃদয়বাবু বাড়ী আছেন ?

ঐ বাড়ীর অন্য একটি ছেলের প্রবেশ] হৃদয়বাবু ! পুলিশ !

বিজয়া। পুলিশ !

হৃদয়। চুরি নয়, বিজয়া, মে ডে !

দৃশ্যান্তর

হৃদয়ের প্রস্থান ; সঙ্গে সঙ্গে বিজয়া ও আর সকলের অনুগমন, বাড়ীর প্রবেশ পথে—

পুলিশ ইন্সপেক্টর। কিছু না, শুধু একটা স্টেটমেণ্ট।

বিজয়া। কী ?

হৃদয় ! একটা শুধু স্টেট্‌মেণ্ট—

বিজয়া। তাই—কি ?

পুলিস ইন্সপেক্টর। ওঁকে একবার যেতে হবে।

বিভা। গ্রেপ্তার ?

হৃদয়। না –না না, একটু সন্দেহ, শুধু একটু

বিজয়া। সন্দেহ ?

হৃদয়। বিজয়া, আজ মে ডে —আমার গ্রেপ্তারের বাৎসরিক উৎসব

পুলিস ইন্সপেক্টর। নিন্, তৈরী হয়ে নিন।

হৃদয়। আমি তৈরী।

বিজয়া। পলে পলে পাহারা দিয়ে রেখেও তুমি তৈরী, তুমি যাবে ?

হৃদয়। ফের আস্‌ব, বিজয়া।

বিজয়া। আর ছট্‌ফট্‌ করে মরবে মুক্তির খাঁচায় – বন্ধনেই তোমার আনন্দ।

হৃদয়। ভুল বিজয়া, মুক্তির জন্যই বন্ধনকে মেনে নি। ভেবো না তুমি– হয়তো—

বিজয়া। হয়তো আজকেই আস্‌বে—আস্‌বে আমার কানা তুমি—হয়তো - দরকার ? দেখ্‌ছি তোমার দোষ নেই। শান্তিরক্ষকেরা ঘরে ঘরে কারাগারে—কেন, কি তোমাদের ডাকে কিন্তু পুড়ে মরি আমরা। বেশ আমি তৈরী।

হৃদয়। তুমি তৈরী ?

বিজয়া। হ্যাঁ, আজ মে ডে—চলুক দুই বন্ধনের লড়াই—শাসকের আর নারীর। আমি যাব—

হৃদয়। সে কি! কোথায় ?

বিজয়া। যে ঘরে তুমি নেই সে ঘর অর্থহীন—ময়দানের ফাঁকা মাঠই তার আশ্রয়। আর আজকের ভীড়ের মাঝে যদি তোমায় খুঁজেই পাই তবে সেই হবে আমার অবলম্বন।

হৃদয়। ঘরে যাও বিজয়া।

বিজয়া। ঘরে ? এই দিলাম ওর গলায় শেকল তুলে [দরজায় শেকল তুলিয়া দিল] আজ মে ডে—আজ সর্বহারার উৎসব। [বিজয়া হৃদয়ের পদধূলি লইল] এস তুমি

[পুলিশ সহ হৃদয়ের প্রস্থান, বিজয়া প্রস্থানোদ্যত]

বিভা। মামীমা !

আভা। আমরাও যাব মামীমা।

বিজয়া। ছি! তোমরা কেন, এ যে সর্বহারার উৎসব, ঘরের শেকল খুলতে হয় তোমরাই খুলো। মামা-মামী যদি ফেরেই, বরণ ক'রো— [প্রস্থান ও যবনিকা

"একদিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি সঞ্চয় করেন না আমাদের প্রাচীন সংহিতার সেই দ্বিজ গৃহীকেই প্রশংসা ক'রেছেন। কেন না একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহুদূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমন কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রকাব্য ও সত্য

বিনয় দত্ত

আমাদের এক বন্ধু বল্‌ছিলেন—চৈতন্যদেবের পর এত বড় লোক দেশে আর জন্মায়নি। বড় লোক কথাটার নানা ব্যঞ্জনা, তবুও মনে হচ্ছে সর্ব্বাংশে এই কথাটা সত্য। পরে কে কবে কোন 'করচা' বার করবে—তা করুক, তা সূর্য্যের গায়ে কাল দাগের মত। শুন্‌ছি এক যুগ চলে গেল। মনে হচ্ছে, যেন এক যুগের সূত্রপাত হল যার হোতা দধিচীর মত অস্থি দিলেন—স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠায়। তাঁর যুগের লোক তাঁকে বোঝেনি। প্রথম পুরুষ তাঁকে চিনতো অমুকের ছেলে বলে। দ্বিতীয় পুরুষ তাঁকে জেনেছিল সহকর্ম্মী বলে। তৃতীয় পুরুষ আমরা তাঁকে মেনে নিয়েছি কবিগুরু গুরুদেব বলে। উদয়-সূর্য্যের কিরণ মধ্যাহ্নের ইঙ্গিত দেয় মাত্র, মধ্যাহ্নের তেজ এত প্রখর তখন সূর্য্যের দিকে তাকান যায় না, অস্তরবির দিকে চেয়ে স্মরণে আসে মধ্যাহ্ন আর রাত্রি। আজ আমাদের সামনে এলো রাত্রি—নিবিড় ঘন কাল অন্ধকার। রাজনৈতিক জীবন পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের তাণ্ডবে পড়ে কি রূপ নেবে, কে তার কাণ্ডারী হবে আজও কোন লক্ষণ স্পষ্ট হয়নি। গতজীবনের ভিত্তি ফোয়ারার স্তম্ভের মত চৌদিকে ভেঙ্গে পড়ছে। এজীবনের ভিৎ এখন গড়ে উঠেছে কিনা বলা যায় না। সূর্য্য অস্ত গেলো। কে করবে রাত্রি ব্যাপি তপস্যা দিনের জন্যে। আমরা। আমাদের জীবন গড়ে উঠেছে পাশাপাশি ইংরাজি শিক্ষার আওতায় আর কবিগুরুর কাব্যের ঝঙ্কারে। আমরা দেখেছি তাঁর দিগন্তব্যাপি অস্তরবির বর্ণচ্ছটা—আমরা বুঝেছি ঘনায়মান অন্ধকারের আকুলতা আর শুনেছি তার আর্ত্তনাদ। এক যুগ তাঁর প্রতিভার অস্তিত্বই জানেনি, আর যুগ তাঁর বিরাটত্বকে প্রণিধান করতে পারেনি, আমাদের সৌভাগ্য আমরা তাঁর শিষ্য হয়ে দুইই বুঝেছি! তাই তাঁর বিরহ একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত শোক। গুরুর তিরোধানে শিষ্যরা তপস্যা করে তাঁর শিক্ষাকে সার্থক করতে। আমাদের মধ্যে থেকেই জন্ম নেবে প্লোটো, সেণ্টপল। তাঁর মন্ত্রে আমাদের দীক্ষা হয়েছে জন্ম হতে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে। আজও যারা জন্ম গ্রহণ করেনি তাদের কাছে তাঁর পরিচয় দেবার ভার আমাদের। যদি এ ভার বহন করতে পারি ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। না পারলে, পরাঙ্মুখ হলে দিন আর আসবে না, চিররাত্রি আমাদের ঘিরবে। স্বর্গ জিন্‌তে হবে আমাদেরই কাণ্ডারীর সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অনুসারে। আমরাই সে তপস্যার অধিকারী।

উচ্ছ্বাসের কথা নয়। আগের যুগে পরাধীনতা ছিল নিত্য, মন সে পরাধীনতার চাপে পঙ্গু হয়েছিল, চোখে ঠুলি পরান ছিল। তাই কবির সমাদর হয় নোবেল প্রাইজ পাবার পর। বিদেশী তাঁর কপালে জয়টীকা পরাবার পর চোখ খোলে, সূর্য্যের আলো দেখ্‌তে পায়—তখনও অনভ্যস্ত চোখ। আমাদের মনে নন্‌কোঅপারেসনের ধাক্কা পরাধীনতার গুরুভার খানিকটা লাঘব করেছিল। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা ভাবতে পারি বিদেশী সংসর্গ-বিবর্জ্জিত দেশের কথা। কবিগুরুর কাব্য সেই দেশের। তাঁর নিরন্তর সংগঠন পরিকল্পনা সেই ভবিষ্যরাজ্যের। তাঁর কাব্যলোকে পরাধীনতার ছায়াপাত নেই। কবিমন সামান্য বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে ধ্রুব নিত্য ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট প্রকৃতি উপলব্ধি করেছিলেন।

যারা তাঁকে আমাদের মত কাব্যের মধ্য দিয়ে পেয়েছে, দূর হতে কেবল মাত্র কথা শুনেছে, ঋষিপ্রতিম মূর্ত্তি দেখেছে, তাদের কবি গুরু বিদেহী সর্ব্বগুণসম্পন্ন সকল প্রেরণার উৎস। আমাদের মনের ভাব, ভাষা, আমাদের আত্মার আকৃতি সবেরই এই এক উৎস—অস্ত সূর্য্যের বর্ণচ্ছটায় আমরা অনুক্ষণ অনুরঞ্জিত। মনের গহনে অবচেতন অন্তরে তাঁরই কাব্যের রোমান্টিসিজম সিক্ত। তাই আমাদের সফলতম রচনাতেও তাঁরই সুরের অনুরণন শোনা যায়।

আমরাই তাঁকে কাছেও পেয়েছি, দূরেও পেয়েছি। তাঁর শিক্ষায় মানুষ হয়ে আমরা বিদেশীর নিছক অনুকরণ ছেড়েছি, কারণ আজ আমাদের ঐশ্বর্য্য অফুরন্ত, তার প্রকাশও প্রাণবন্ত।

যে যুগের সূচনা দেখা যায় তার দুরন্ত উচ্ছল অপর্য্যাপ্ত প্রাণশক্তিকে সংহত করার ভার তিনি নিজে নিতে পারলেন না, এই যা আক্ষেপ। কথায় বলে, নেতার প্রয়োজন হলে আপনি তাঁর আবির্ভাব হয়। তাই মেনে নিয়ে আজ মনকে প্রবোধ দিই। কে জানে কোন প্লেটো গুরুর তপস্যা সার্থক করার জন্য এগিয়ে আস্‌বে। কবে কত শত বর্ষ পরে সেণ্টপলের আবির্ভাব হবে।

"আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরাজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এই জন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁসিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রাকৃতিক

(উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ (শেষাংশ)

সরোজকুমার মজুমদার

শীলা ওকে থামিয়ে ব'ললো,—দাদুর কাছে যেতে হবে না, শোন। দাঁড়া তোকে বুঝিয়ে বলছি রে। আচ্ছা, তুই যে খুকুকে সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছিলি, কেটে গেলে কী হ'তো! রক্ত বেরিয়ে যেতো না? লাল রক্ত! এই এতখানি রক্ত বেরিয়ে যেতো খুকুর হাত থেকে? তবে কী হ'তো?

শঙ্কর মুখ কাঁচু মাচু ক'রে ওর কথার প্রতিধ্বনি ক'রলো,—তবে কী হ'তো? খুকু মরে যেতো পিসিমা?

– ছি, মরে যাবে কেন? ও-কথা ব'লতে নেই, খাও খুকুকে একটা চুমু খাও।

শঙ্কর বোনের গোলাপী ঠোঁটে ছোট্ট একটা চুমো খেলো।

—লক্ষ্মী ছেলে। শঙ্করের মতো ছেলে আমি তো একটাও দেখিনি, নন্তুর চেয়ে অনেক—অনেক ভালো তুমি শঙ্কর।

লজ্জায় লাল হ'য়ে শঙ্কয় চোখ নামালো।

শীলা নত হ'য়ে শঙ্করের নমিত কাঁধে অধর স্পর্শ ক'রে ব'ললো, এবার আমায়, আমায় চুমো দেবে না?

শঙ্কর দুই হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে শীলার ঠোঁটে চুমো খেলো। চোখ বুজে শীলা হাত দিয়ে ওর বাঁ-গাল দেখিয়ে দিয়ে বললো,—এখানে।

শঙ্কর আর একটা চুমো খেলো।

—আর এখানে।

শঙ্কর হাসতে হাসতে ওর ডান গালে আবার ঠোঁট ছুঁইয়ে দিলো।

—এবার চোখে, এই চোখে! শীলা সবলে শঙ্করকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রলো।

এ রকমের খেলা শঙ্করের সঙ্গে ওর প্রায়ই হয়। প্রচুর উৎসাহ আছে শঙ্করের এ-কাজে।

শঙ্কর আবার চুমো খেলো শীলার চোখে, পরে ওই চোখে, আবার কপালে, চুলে, সমগ্র মুখমণ্ডলে শঙ্কর ওর রাঙা ঠোঁটের শীতল স্পর্শ মাখিয়ে দিলো।

—কখন এলি, শীলা। এসেই সুরু ক'রেচিস্ খেলা।

শীলা অপ্রস্তুতভাবে পেছন ফিরে চাইলো বড় বৌদির দিকে: অনেকক্ষণ এসেছি বৌদি!

প্রতিমা এগিয়ে বললো,—সাত সকালে কিছু মুখে না দিয়ে কোথায় গিয়েছিলি শুনি?

মাথা নীচু ক'রে স্মিত হাস্যের সহিত শীলা ব'ললো, সুষমার হস্‌টেলে।

—ছ্যাখা হ'লো? আয়, খেতে আয়।

—খেয়ে এসেছি সুষমার ওখান থেকেই বৌদি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠ্‌তে লাগলো: শরীরটা যেন দিন দিন কাহিল হ'য়ে প'ড়ছে। কেন? আগে কেমন চট্‌পট্ উঠে যেতাম! আজকাল কেমন ক্লান্ত বোধ করি। রেলিং-এ ভর না দিয়ে ওঠা অসম্ভব দেখছি।

দোতালার মেঝেতে এবার পা প'ড়লো। ডান-হাতের প্যাসেজটা দিয়ে গেলে শেষের দিকে ঘরটা ওর। তার এপাশের একটা রাঙাদার, আরটা মেজবৌদির আর মেজদার।

শীলা ওর ঘরের দুয়োরের কাছে আসতেই কানে এলো, কে গেলো?

একটু পিছিয়ে এসে ও ব'ললো,—আমি। কেন রাঙা দা?

—আমার দরজার সামনে এসো! শীলা এলো।

—ডানদিকের দেওয়ালে টাঙানো বিজ্ঞাপনটা পড়ো তো ভাই।

বিজ্ঞাপন প'ড়ে শীলা না হেসে পারলো না: বাব্বা, এত-ও জানো তুমি রাঙা দা!

—জানিস্ না, বীরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে ব'ললো—জানিস্ না সায়েন্স কোর্স সম্বন্ধে তো আর তোদের কোন আইডিয়া নেই! এ সিভিক্স নয় বা লজিক নয় যে ছ-আনার নোট প'ড়ে স্রেফ উৎরে যাওয়া চলে, জানিস্ বাহান্নটা মেটাল সম্বন্ধে নাড়ী নক্ষত্র জানা চাই। অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল আর বেসিক্ র‍্যাডিক্যাল গুলোর হদিস পেতে তোদের কলা বিভাগের চোখ যাবে উল্টে!

শীলা ব'ললো—আহা! তাহ'লে তোমাদের পাশের পার্সেণ্টেজ আর আমাদের চেয়ে বেশী হ'তো না।

পার্সেণ্টেজের কথা ছেড়ে দে! ওতে কি আর শক্ত সোজা বিচার করা যায়? প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ সম্বন্ধে যদি কোন ধারণা থাকতো তবে বুঝতিস্, হ্যা, কী জিনিষ! বাঘ সিংহের মতো মারাত্মক। একদিন প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাশে অ্যাবসেণ্ট হ'য়েছিলাম, আ-ও তাবার

থার্ড ইয়ারে, ফাদার আমায় কী বলেন জানিস্—বুঝিস্ না কিছু, ভাবিস্ সবই বুঝি সংস্কৃত।

শীলা হেসে গড়িয়ে প'ড়লো প্রায়,—ভগবান দেখছি শুধু তোমায়ই যতো কঠিনের পরীক্ষায় ফেলেচেন। কী এমন প'ড়ছো শুনি যে এ-বারান্দা দিয়ে লোক চ'ললে তোমার পড়ার বিঘ্ন হবে। উঃ! এর জন্য যে একটা নোটিস দিতে হয় এ-অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন। বেশ! যাবো, ও-দিক দিয়ে ঘুরেই যাবো এখন থেকে কিন্তু এবার ফার্স্ট ক্লাশ না পেলে তোমাকে আর রাখচি না।

—শুধু ফার্স্ট ক্লাশ? এবার রেকর্ড ব্রেক্ করচি দেখিস্। বাঁ-হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠি দিয়ে জোরে আঘাত ক'রে বীরেন ব'ল্‌লে, তারপর ঘরের মধ্যে চ'লে গেলো।

শীলা বেশ দেখা যাবে, ব'লে—নিজের ঘরে যাচ্ছিলো, বীরেন আবার চেঁচিয়ে উঠলো,—এই শোন্‌তো!

শীলা এলে ব'ললো,—সামান্য! বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জ্জনী দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে ব'ললো, সামান্য দেড়-ইঞ্চি ক্যালশিয়াম হাইড্রক্‌সাইড নিয়ে আয়তো নীচে থেকে!

—ক্যালশিয়াম হাইড্রক্‌সাইড! শীলা আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললে,—সে আবার কী জিনিষ?

—ওঃ! তোর জানার কথা নয় বটে! তোর আবার আর্টস্ কোর্স! সব সময় মনে থাকে না! দিনরাত কোহেন, প'ড়ে প'ড়ে সায়েন্সের আবর্জ্জনা ঢুকে গেছে ঘিলুর মধ্যে।

—এতও বাজে বক্‌তে পারো! এতে পড়ার ক্ষতি হচ্ছে না তোমার! বলো না পরিষ্কার ক'রে কী আন্‌তে হবে!

—শিখে রাখ এবার থেকে ক্যালশিয়াম হাইড্রকসাইড হ'চ্ছে চূণ, যে-চূণ পানে খাই! দেয়ালের আস্তর ভেঙে চূণ আনিস্ না—ওগুলো হবে শুধু ক্যালশিয়াম অক্‌সাইড। আর, আর দেড় ইঞ্চি মানে বুঝেচিস্ তো, সামান্য! এই এত টুকুন! বীরেন দু-আঙ্গুলের ফাঁক দেখিয়ে দিলো। শীলা চূণ আন্‌তে নীচে নেমে গেলো।

রাঙাদাকে ওর এমন মিষ্টি লাগে! একেবারে ছেলেমানুষ। এতটুকু গাম্ভীর্য্য নেই। খালি নিজের সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা।

সেদিন ওরা সবাই ব্রীজ খেলতে ব'সেছিলো দুপুরে। সোনাদা আর বড় বৌদি একদিকে আর আরেকদিকে রাঙাদার পার্টনার হ'য়ে ও নিজে। বড় বৌদির চিরের বিবির ওপরে শীলার হাতে চিঁরিতনের সাহেব থাকা সত্ত্বেও ও মার্‌তে সাহস করে নি। ভয় হ'য়েছিলো, সোনাদার কাছে যদি টেক্কাটা থেকে যায় তবে সাহেবটা ওর বেঘোরে মারা যায়।

বীরেন ধমক দিয়ে ব'ললো,—সাহেব চেপে গেলি কেন? থার্ড হ্যাণ্ড অলওয়েজ